

المختصر المفيد للمؤذن والإمام
والخطيب وأحكام المساجد
মুয়াজ্জিন, ইমাম, খতীব এবং
মসজিদ বিষয়ক পুস্তিকা

মুয়াজ্জিন, ইমাম, খতীব এবং মসজিদ বিষয়ক পুস্তিকা

বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিষয়বস্তুর সেবা সম্পর্কিত
সংস্থার একাডেমিক কমিটি

মুয়াজ্জিন, ইমাম, খতীব এবং মসজিদের বিধান বিষয়ক উপকারী পুস্তিকা

বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিষয়বস্তুর সেবা সম্পর্কিত
সংস্থার একাডেমিক কমিটি

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছেই ইস্তেগফার করি। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের নফসের অনিষ্টসমূহ এবং আমাদের কর্মের অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ প্রদর্শনকারী কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মাবুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর ওপর, তার পরিবার ও সকল সাহাবীর ওপর এবং ইহসানের সঙ্গে যারা তাদের অনুসরণ করবে তাদের সবার ওপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

অতঃপর, মানুষের সার্বিক অবস্থার সংশোধন যেহেতু এক স্থায়ী প্রয়োজন, সেহেতু শরী'আত তা

নিশ্চিতকারী বিধানাবলী নিয়ে আগমন করেছে।
 তন্মধ্যে সালাতের জন্য আযান ও ইকামাত দেয়া, তাতে
 মানুষের ইমামতি, জুমু'আর খুতবা প্রদান এবং
 মসজিদের বিধানসমূহ অন্যতম। এজন্যই মসজিদের
 মুয়াজ্জিন, ইমাম এবং জুমু'আর খতীবের দায়িত্ব
 অত্যন্ত মহান। আর একারণেই আমরা (المختصر المفيد)
 (للمؤذن والإمام والخطيب وأحكام المساجد) তথা 'মুয়াজ্জিন,
 ইমাম, খতিব এবং মসজিদের বিধান বিষয়ক উপকারী
 পুস্তিকা' শিরোনামে একটি বই সংকলন এবং তা
 কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হয়েছি।

(আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে বহু আয়াতে
 নিজের

সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করেছেন, যা মূলত
 আরাবী ভাষার একটি রীতি। বাংলায় এরীতির ব্যবহার না
 থাকায় সে সব আয়াতের অনুবাদে বইটিত একবচনই
 ব্যবহার করা হয়েছে। (সম্পাদক, আব্দুর রব আফ্ফান)

প্রথম অধ্যায়: আযান ও ইকামাতের বিধানসমূহ

আযান হলো ইসলাম ও তার অনুসারীদের নিদর্শন,
 যেহেতু দিনে ও রাতে পাঁচবার এর মাধ্যমে আহ্বান করা
 হয়। আলেমগণ তাঁদের গ্রন্থসমূহে এর বিধান, সুন্নাত,
 আহকাম, মুস্তাহাব ও বাতিলকারী বিষয়াদি সম্পর্কে

বিশদ আলোচনা করেছেন; আর তা কেবল এই ইবাদতের গুরুত্ব ও মর্যাদার কারণেই^১।

প্রথম অনুচ্ছেদ: আযান ও ইকামাতের সংজ্ঞা

শরীয়তের পরিভাষায় আযান হলো: পরিচিত, নির্দিষ্ট ও শরীয়তসম্মত কিছু বাক্যের মাধ্যমে সালাতের ওয়াক্ত প্রবেশ করার ঘোষণা দেওয়া^২।

আর শরীয়তের পরিভাষায় ইকামাত হলো: এক নির্দিষ্ট ও শরীয়তসম্মত যিকিরের মাধ্যমে সালাতে দাঁড়ানোর ব্যাপারে অবহিতকরণ^৩।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: আযান ও ইকামাতের

হুকুম

আযান ও ইকামাত কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত:

কুরআনের দলীল হল, আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (58)

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (58)

“আর যখন তোমরা সালাতের প্রতি আহবান কর তখন তারা সেটাকে হাসি-তামাশা ও খেলার বস্তুরূপে

১ দেখুন: ফাতহুল মুন'ইম শারহু সহীহ মুসলিম: (২/ ৪৬০)।

২ দেখুন: আল-মুগনী, ইবনু কুদামাহ: (১/২৯২), মুখতারুস সিহাহ: (পৃষ্ঠা ১৬)- মাদ্দাহ: হামযা যাল নুন, এবং আল-আযান ওয়াল ইকামাহ লিল-কাহতানী: (পৃষ্ঠা ৫)।

৩ দেখুন: কাশশাফুল কিনা': (১/২৩০)।

গ্রহণ করে –এটা এ জন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা বোঝে না।” [আল-মায়িদাহ: ৫৮]

আর সুন্নাহর দলীল হলো, এ দুয়ের বিধানের পক্ষে অসংখ্য হাদীস রয়েছে, তন্মধ্যে:

“ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মুসলিমগণ যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন তারা একত্রিত হতেন এবং অনুমানের ভিত্তিতে সালাতের সময় নির্ধারণ করতেন; এর জন্য আযান দেয়া হতো না। অতঃপর একদিন তারা এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। তাদের কেউ কেউ বললেন, খ্রিষ্টানদের ঘন্টা বাজানোর মতো ঘন্টা গ্রহণ কর। আর কেউ কেউ বললেন, বরং ইয়াহূদীদের শিঙ্গার মতো একটি শিঙ্গা গ্রহণ কর। তখন উমার বললেন, তোমরা কি একজন লোককে পাঠাবে না, যে সালাতের জন্য ঘোষণা দেবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

«يَا بِلَالُ، فَمَنْ فَنَادَ بِالصَّلَاةِ».

1. «يَا بِلَالُ، فَمَنْ فَنَادَ بِالصَّلَاةِ».

“হে বিলাল! দাঁড়াও। অতঃপর সালাতের জন্য আহ্বান কর।”

আর ইজমা হলো: উম্মত পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য এ দুটি শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছে:

1 সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৬০৪), সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৩৭৭)।

ইমাম ইবন কুদামা আল-মাকদিসী বলেন: আর উম্মত ঐক্যমত্য পোষণ করেছে যে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য আযান দেওয়া বিধানসম্মত।^১

আযান ও ইকামাত পুরুষদের ক্ষেত্রে সফরে ও আবাসে উভয় অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য ফরযে কিফায়া, অন্য কোনো সালাতের জন্য নয়; কেননা মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেছেন:

«فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»

32

«فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»

“সুতরাং যখন সালাতের সময় হবে তখন তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।”^২

এবং এ দু’টি ইসলামের বাহ্যিক নিদর্শনের অন্তর্গত, সুতরাং তা বন্ধ করা জায়েয নয়।

নারীদের জন্য আযান বা ইকামত দেওয়া বৈধ নয়, তা সে একাকী সালাত আদায় করুক বা নারীদের ইমামতি করুক^৩।

১ আল-মুগনি: (১/ ২৯৩)।

২ সহীহ বুখারী হাদীস নং (৬২৮), সহীহ মুসলিম হাদীস নং (৬৭৪)।

৩ শারহুল উমদাহ লি-ইবন তাইমিয়াহ - কিতাবুস সালাত (পৃ. ১০১)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আযান ও ইকামাতের ফযীলত

আযান ও মুয়াজ্জিনদের ফযীলত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত ফযীলতসমূহ উল্লেখযোগ্য:

মুয়াজ্জিন হল আল্লাহর দিকে দায়ীদের একজন, আর তিনি কথার দিক থেকে সর্বোত্তম মানুষ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ 33

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ 33

“আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম যে আল্লাহর দিকে আহবান জানায় এবং সৎকাজ করে। আর বলে, ‘অবশ্যই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।’ [ফুসসিলাত: ৩৩]

কিয়ামতের দিনে মুয়াজ্জিনগণ সবচেয়ে উঁচু ঘাড়ের অধিকারী হবেন; কেননা মু'আবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

«الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“কিয়ামতের দিনে মুয়াজ্জিনগণ সবচেয়ে উঁচু ঘাড়ের অধিকারী হবেন।”^১

আযান ও ইকামাত শয়তানকে বিতাড়িত করে; এ মর্মে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأَذِينَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّأَذِينَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا تَوَبَّ بِالصَّلَاةِ -أَيُّ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ- أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّنَوُّبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ -أَيُّ: يُوسَّوسُ- بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ كَذَا وَادْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَذْرِي كَمْ صَلَّى»

«إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأَذِينَ»
-فَإِذَا قُضِيَ التَّأَذِينَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا تَوَبَّ بِالصَّلَاةِ -أَيُّ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ-
-أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّنَوُّبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ -أَيُّ: يُوسَّوسُ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ كَذَا وَادْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ
«حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَذْرِي كَمْ صَلَّى»

“যখন সালাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান পিঠ দেখিয়ে পালায় আর তার পশ্চাদবায়ু সশব্দে নির্গত হতে থাকে, যাতে আযান শুনতে না পায়। আযান শেষ হয়ে গেলে সে আবার ফিরে আসে। অতঃপর যখন সালাতের জন্য ইকামাত দেওয়া হয় (অর্থাৎ সালাত কায়েম করা হয়), তখন সে পিঠ দেখিয়ে পালায়। ইকামাত শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরে আসে। এমন কি সে সালাতরত ব্যক্তির মনে ওয়াস্‌ওয়াসা সৃষ্টি করে (অর্থাৎ ওয়াস্‌ওয়াসা দেয়) এবং তাকে বলতে থাকে,

১ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৩৮৭)।

অমুক অমুক বিষয় স্মরণ করো, যা সালাত শুরু করার আগে তার স্মরণে ছিলো না। এক সময় সে এমন হয় যে, কত রাকাত সালাত আদায় করেছে স্মরণ করতে পারে না।”¹

মুয়াজ্জিনের আযান শ্রবণকারী প্রতিটি বস্তুই তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে; এ মর্মে আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আল-আনসারী থেকে বর্ণিত যে, আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বলেছেন: ‘আমি দেখছি তুমি ছাগল-ভেড়া ও মরু প্রান্তর ভালোবাসো। সুতরাং যখন তুমি তোমার ছাগল-ভেড়ার পালের সাথে বা মরু প্রান্তরে থাকবে এবং সালাতের জন্য আযান দেবে, তখন উচ্চকণ্ঠে আযান দেবে। কেননা,

«لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ، جَنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

«لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ، جَنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি যতদূর পর্যন্ত পৌঁছায়, জিন, ইনসান বা অন্য যা কিছুই তা শোনে, কিয়ামতের দিন সে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।” আবু সাঈদ বলেন: আমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি।²

মানুষ যদি আযানের প্রকৃত ফযীলত সম্পর্কে জানত, তাহলে কে আযান দেবে তা নির্ধারণের জন্য

1 সহীহ বুখারী হাদীস নং (১২২২), সহীহ মুসলিম হাদীস নং (৩৮৯)।

2 সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৬০৯)।

তারা নিজেদের মধ্যে অবশ্যই লটারি করত। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ - أَيْ: الْأَذَانِ - وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهْمُوا»

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ - أَيْ: الْأَذَانِ - وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَأَسْتَهْمُوا»

“লোকেরা যদি আযান দেওয়া ও সালাতের প্রথম কাতারে কী (ফযীলত) রয়েছে তা জানত, অতঃপর তা অর্জন করতে লটারির বিকল্প না পেত, তাহলে অবশ্যই তারা লটারি করত।”^১

মুয়াজ্জিনকে তার কণ্ঠস্বরের শেষ সীমা পর্যন্ত ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং সজীব ও নির্জীব যা কিছু তার আযান শোনে, তা তাকে সত্যায়ন করে। আর তার সাথে যারা সালাত আদায় করে, তাদের সাওয়াবের সমপরিমাণ তার জন্যও রয়েছে; কেননা, ভালো কাজের পথপ্রদর্শক তা সম্পাদনকারীর অনুরূপ। বারা ইবন আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمَقْدَمِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدُّ صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ»

«إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمَقْدَمِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدُّ صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ»

১ সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৬১৫), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ৪৩৭)।

“নিশ্চয় আল্লাহ প্রথম কাতারের লোকদের উপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণ তাদের জন্য দো‘আ করেন। আর মুয়াজ্জিনকে তার কণ্ঠস্বরের শেষ সীমা পর্যন্ত ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং সজীব ও নিরুজীব যা কিছু তার আযান শুনে, তারা তাকে সত্যায়ন করে। আর তার সাথে যারা সালাত আদায় করে, তাদের সমপরিমাণ সাওয়াবও তার জন্য রয়েছে।”^১

নিশ্চয় আযান ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন; আর তা দারুল কুফর ও দারুল ইসলামের মধ্যে পার্থক্যকারী। ইমাম বুখারী তার সহীহ গ্রন্থে এই শিরোনামে একটি অধ্যায় সংকলন করেছেন: “অধ্যায়: আযানের মাধ্যমে রক্তপাত থেকে নিরাপত্তা লাভ”। অতঃপর তিনি আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন: “أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا، لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ”^২।

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের নিয়ে কোনো কওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন, তখন সকাল না হওয়া পর্যন্ত তিনি আক্রমণ করতেন না। অতঃপর তিনি যদি আযান শুনে পেতেন, তবে তাদের ওপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকতেন, আর যদি

১ হাদীসটি আহমাদ (১৮৫০৬) ও নাসাঈ (৬৪৬) বর্ণনা করেছেন। মুনিরী ‘আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব’ (১/১৭৬)-এ বলেছেন: “এর সনদ হাসান জায্বিদ।” আর ইবনুল মুলাক্কিন ‘আল-বদরুল মুনীর’ (৩/৩৮৫)-এ বলেছেন: “এই সনদটি জায্বিদ।”

২ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৬১০), সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৩৮২)।

আযান না শুনতেন, তবে তাদের ওপর আক্রমণ করতেন”। ইমাম খাত্তাবী বলেছেন: “এতে দলীল রয়েছে যে, আযান হলো ইসলামের একটি নিদর্শন এবং এটি একটি ওয়াজিব বিধান, যা পরিত্যাগ করা জায়েয নয়। আর যদি কোনো জনপদের অধিবাসীরা আযান পরিত্যাগ করার উপর একমত হয়ে তা থেকে বিরত থাকে, তবে শাসক তাদের বিরুদ্ধে এর জন্য যুদ্ধ করতে পারবে”।^১

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: আযান ও ইকামাত শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ

১- মুসলিম হওয়া: সুতরাং কাফেরের পক্ষ হতে উভয়টি শুদ্ধ হবে না; কেননা উভয়টি ইবাদত, আর কাফেরের পক্ষ হতে ইবাদত শুদ্ধ হয় না।

২- জ্ঞানবান হওয়া: সুতরাং অন্যান্য সকল ইবাদাতের মত পাগল, মাতাল এবং বিবেকহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু থেকে উভয়টিই শুদ্ধ হবে না।

৩- নিয়ত: নিয়ত ব্যতীত এ দুটি শুদ্ধ হবে না; কারণ, উভয়টি ইবাদত, আর ইবাদত নিয়ত ব্যতীত শুদ্ধ হয় না; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

72

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»

^১ আ'লামুল হাদীস শরহ সহীহিল বুখারী: (১/৪৬০)।

“নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক মানুষের জন্য তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল রয়েছে।”^১

৪- পুরুষ হওয়া: নারীর আযান ও ইকামাত বিশুদ্ধ হবে না।

৫- সালাতের ওয়াক্তে আযান দিতে হবে: সুতরাং এর ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দিলে তা শুদ্ধ হবে না; কেননা মালিক ইবনুল হুওয়াইরিছ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«... فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»

«فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ...»

“সুতরাং যখন সালাতের সময় হবে তখন তোমাদের মধ্যে কেউ একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।”, সুতরাং তিনি আযানের বিষয়টিকে সালাতের উপস্থিতির সাথে যুক্ত করেছেন, যা কেবল তার ওয়াক্ত হওয়ার পরেই হয়ে থাকে, এবং ইকামাত দিতে হবে সালাতের জন্য দাঁড়ানোর ইচ্ছা করার সময়।^২

৬- আযান ও ইকামাত ধারাবাহিকভাবে পর্যাক্রমে দিতে হবে: ধারাবাহিকতার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: মুয়াজ্জিন আযান ও ইকামাতের শব্দগুলো শরয়ী

১ সহীহ বুখারী হাদীস নং (১), মুসলিম হাদীস নং (১৯০৭), উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত।

২ বুখারী, হাদীস নং (৬২৮), মুসলিম, হাদীস নং (৬৭৪)।

দলীলসমূহে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই আদায় করবে; কোনো শব্দ বা বাক্যকে আগে-পরে করবে না। কারণ আযান একটি ইবাদাত যা এ ধারাবাহিকতা অনুসারেই সাব্যস্ত হয়েছে, সুতরাং যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবেই তা আদায় করতে হবে; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ উক্তির কারণে:

«مَنْ أَدَّاهُ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ»

«مَنْ أَدَّاهُ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ»

“যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে নতুন এমন কিছু আবিষ্কার করল যা তাতে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।”^১

৭- আযান ও ইকামত পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে দিতে হবে: আর পরস্পর অবিচ্ছিন্নতার উদ্দেশ্য হলো, কথা বা কাজের দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটানো ছাড়াই আযানের শব্দগুলো পরস্পরভাবে বলা এবং এর এক অংশ ও অন্য অংশের মাঝে দীর্ঘ সময় বিরতি না দেওয়া।

৮- আযান এবং অনুরূপভাবে ইকামাত আরবী ভাষায় ও সুন্নাহে বর্ণিত শব্দাবলীর মাধ্যমে হতে হবে, এবং তা অর্থ বিকৃতকারী ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে হবে।

৯- আযানে আওয়াজ উঁচু করা; কারণ মুয়াজ্জিন যদি তার আওয়াজ এমনভাবে নিচু করে যে, কেবল নিজেই শুনতে পায়, তাহলে আযান বিধিবদ্ধ করার উদ্দেশ্য

^১ সহীহ বুখারী হাদীস নং (২৬৯৭) এবং মুসলিম হাদীস নং (১৭১৮), আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস।

হাসিল হবে না; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«فَلْيُؤْذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ»

«فَلْيُؤْذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ»

“তোমাদের একজন তোমাদের জন্য আযান দিবে।” আর এটা আওয়াজ উঁচু করার দিকে ইঙ্গিত করে, যাতে অন্যদেরকে শোনানো যায়; ফলে এর মাধ্যমে জানানোর উদ্দেশ্য হাসিল হয়। সুতরাং যখন কেউ নিজের জন্য অথবা তার সাথে উপস্থিত ব্যক্তির জন্য আযান দিবে, তখন এতে আওয়াজ উঁচু করা শর্ত নয়। কিন্তু সে তার আওয়াজ ততটুকু উঁচু করবে যতটুকু সে নিজে শুনতে পায় অথবা তার সাথে উপস্থিত ব্যক্তি শুনতে পায়। তবে এর চেয়ে বেশি আওয়াজ উঁচু করলে তা উত্তম হবে; কেননা আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন:¹

«... فَإِذَا كُنْتَ فِي غَمَمِكَ أَوْ بِأَدْبَتِكَ فَأَذِّنْتَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالْإِذَاءِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جَنْ وَلَا إِنْشٍ وَلَا شَيْءَ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“...সুতরাং তুমি যখন তোমার ছাগলপালের সাথে বা প্রান্তরে থাক, অতঃপর আযান দাও, তখন আযানে তোমার আওয়াযকে উঁচু কর; কেননা মুয়াজ্জিনের আওয়াযের শেষ সীমা পর্যন্ত জিন, মানুষ বা অন্য

¹ প্রাপ্ত।

কোনো কিছু তা শুনলে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে।”^১

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: মুয়াজ্জিনের জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলী

১- তাকে ন্যায়পরায়ণ ও সঠিক পথে অবিচল হিসেবে পরিচিত হতে হবে; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ ارْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاعْفِرْ لِلْمُؤَدِّينَ»
«الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ ارْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاعْفِرْ»
«لِلْمُؤَدِّينَ»

“ইমাম হলেন জিম্মাদার এবং মুয়াজ্জিন আমানতদার। হে আল্লাহ! ইমামগণকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং মুয়াজ্জিনগণকে ক্ষমা করুন “ মুয়াজ্জিন সালাত ও সিয়ামের সময়ের ব্যাপারে একজন আমানতদার। আর আমানত তো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিই আদায় করে। সুতরাং ফাসিক, প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত বা শিষ্টাচার বিবর্জিত ব্যক্তি মুয়াজ্জিন হতে পারে না।^২

২- মুয়াজ্জিনকে বালিগ হতে হবে; কারণ বালিগ ব্যক্তির আযান অধিকতর পরিপূর্ণ। তবে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে এমন নাবালকের আযানও সহীহ হবে, যদি সে ওয়াক্তমত আযান দেয়। সে আযান দিলে

^১ প্রাপ্তুক্ত।

^২ আবু দাউদ, হাদীস নং (৫১৭), তিরমিযী, হাদীস নং (২০৭)

তা-ই যথেষ্ট বলে গণ্য হবে; কারণ এর মাধ্যমে সালাতের সময় প্রবেশের বিষয়টি জ্ঞাত হয়।

৩- ওয়াক্তসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানী হতে হবে, যাতে তিনি তা অনুসন্ধান করে প্রথম ওয়াক্তে আযান দিতে পারেন। কারণ, এ বিষয়ে জ্ঞানী না হলে ভুল-ত্রুটি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৪- জোরালো কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়া; কেননা আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আযানের স্বপ্ন বিষয়ক হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন:

«إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَإِنَّهُ أُنْدَى وَأَمْدُ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ، وَلْيُنَادِ بِذَلِكَ»

إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَإِنَّهُ أُنْدَى وَأَمْدُ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ
«مَا قِيلَ لَكَ، وَلْيُنَادِ بِذَلِكَ»

“নিশ্চয় এটি একটি সত্য স্বপ্ন। তুমি বিলালের সাথে দাঁড়াও, কেননা তোমার চেয়ে তার কণ্ঠস্বর অধিকতর সুমধুর ও উচ্চ। আর তোমাকে যা বলা হয়েছে, তা তাকে শিখিয়ে দাও, যাতে সে তা দিয়ে আযান দিতে পারে।”, এবং এর মর্ম হলো:

«وَأَمْدُ صَوْتًا مِنْكَ»

“সে কণ্ঠস্বরে তোমার চেয়েও অধিক প্রসারিত” অর্থাৎ: তোমার চেয়ে অধিক উঁচু ও জোরালো কণ্ঠের অধিকারী। এটি প্রমাণ করে যে, উচ্চ ও জোরালো

১ সুনানে তিরমিযী (১৮৯), তিনি এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

কণ্ঠের অধিকারীকে মুয়াজ্জিন হিসেবে নিযুক্ত করা মুস্তাহাব; কারণ আযানের প্রচারের ক্ষেত্রে উঁচু আওয়াজ অধিক কার্যকর।^১

৫- সুন্দর কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়া। কেননা আব্দুল্লাহ ইবন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর পূর্বোক্ত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«فَإِنَّهُ أُنْدَى وَأَمْدٌ صَوْتُكَ مِنْكَ»

«فَإِنَّهُ أُنْدَى وَأَمْدٌ صَوْتُكَ مِنْكَ»

“কারণ তার কণ্ঠস্বর তোমার চেয়ে অধিকতর সুমধুর এবং উঁচু।” অর্থাৎ সবচেয়ে সুন্দর ও সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী।

৬- ছোট ও বড় উভয় নাপাকি থেকে পবিত্র থাকা, কারণ আযান ও ইকামাত আল্লাহ তা‘আলার যিকির, আর যিকিরকারীর জন্য পবিত্র থাকা মুস্তাহাব।

৭- দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«يَا بِلَالُ قُمْ، فَتَدِ بِالصَّلَاةِ»

«يَا بِلَالُ قُمْ، فَتَدِ بِالصَّلَاةِ»

“হে বিলাল! দাঁড়াও, অতঃপর সালাতের ঘোষণা দাও।”, ইবনে মুনযির বলেছেন:^২ “সর্বসম্মত মত এই যে, মুয়াজ্জিনের জন্য দাঁড়িয়ে আযান দেওয়াই সুন্নাত।”^৩

১ দেখুন: তুহফাতুল আহওয়ামী: (১/৪৮১)।

২ সহীহ বুখারী হাদীস নং (৬০৪), মুসলিম হাদীস নং (৩৭৭), ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত।

৩ আল-ইজমা‘, ইবনুল মুনযির: (পৃ. ৩৮)।

৮- কেবলামুখী হয়ে আযান দেওয়া; কারণ আবদুল্লাহ বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আযানের স্বপ্ন সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের একটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন: "... فَأَسْتَقْبَلَ الْفَيْلَةَ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ" ^১৬

অতঃপর তিনি ক্বিলামুখী হলেন এবং বললেন: “আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার...”, ইবনুল মুনযির বলেন: “আর তারা এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, আযানের জন্য ক্বিলামুখী হওয়া সুন্নাত।” ^২

৯- তার শাহাদাত (তর্জনী) আঙুলদ্বয় দুই কানে রাখবে; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বিলাল রদিয়াল্লাহু আনহু আযান দেয়ার সময় এরূপ করতেন। যেমন আবু জুহাইফা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “আমি বিলাল রদিয়াল্লাহু আনহু কে দেখেছি তিনি আযান দিচ্ছিলেন এবং ঘুরছিলেন আর তিনি এদিকে এবং ওদিকে তাঁর মুখ ফিরাচ্ছিলেন। তার দুই আঙ্গুল ছিল তার কানে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি লাল তাঁবুতে অস্থান করছিলেন।...” ^৩

১ আবু দাউদ, হাদীস নং (৫০৭)

২ আল-ইজমা' লি-ইবনিল মুনযির: (পৃ. ৩৮)।

৩ তিরমিযী হাদীস নং (১৯৭) এবং তিনি বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। আর এর মূল বর্ণনা সহীহ বুখারীতে (৬৩৪) এই শব্দে রয়েছে: আওন ইবন আবী জুহাইফাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বিলালকে আযান দিতে দেখেছেন, তখন তিনি আযানের সময় তার মুখকে এদিক-সেদিক ফিরাতে লাগলেন।

ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন: “আর বিদ্বানদের নিকট এর উপরই আমল প্রচলিত রয়েছে: তারা মুস্তাহাব মনে করেন যে, মুয়াজ্জিন আযান দেওয়ার সময় তার আঙ্গুলদ্বয় দুই কানে প্রবেশ করাবেন।”

ইবন শুবরুমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, মুয়াজ্জিনকে কেন তার দুই কানে আঙ্গুল রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন, “উচ্চ আওয়াজের জন্য...”।¹

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন: “সুন্নাত হলো উভয় কানের ছিদ্রে দুই আঙ্গুল রাখা, এবং এটি সর্বসম্মত মত। আল-মাহামেলী তার ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে অধিকাংশ আলেম থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। আমাদের সাথিগণ বলেন, এর আরেকটি ফায়দা হলো, হয়তো কোনো ব্যক্তি বধিরতা, দূরত্ব বা অন্য কোনো কারণে তার আওয়াজ শুনতে পায় না, তখন সে তার আঙ্গুল দেখে আযান দেওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারে।”²

১০- পা দুটি স্থির রেখে, উভয়বার **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** বলার সময় ডানে এবং উভয়বার **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** বলার সময় বামে মুখ ফেরাবে। এর দলীল হলো আবু জুহাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর হাদীস, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে বিলাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর আযান সম্পর্কে বলেন:

1 “আল-আওসাত” (৪/১১)

2 শারহুল মুহাযযাব (৩/১১৩)।

«فَجَعَلْتُ أَتَّبِعُ قَاهُ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا، يَقُولُ: يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ،
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ»؛

فَجَعَلْتُ أَتَّبِعُ قَاهُ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا، يَقُولُ: يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى
«الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ»^১;

“আমি তার মুখকে এদিক-ওদিক ঘুরাতে দেখলাম, তিনি ডানে ও বামে বলছিলেন: (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ) তথা ‘সালাতের দিকে আসো, (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) তথা সফলতার দিকে আসো’।”; আর মসজিদ থেকে দূরে অবস্থানকারীদের নিকট সালাতের আযান পৌঁছানোর জন্য এটি অধিক কার্যকর।

১১- আযান স্পষ্ট করে টেনে টেনে দিবে, তবে অতিরিক্ত দীর্ঘ ও লম্বা করবে না; কারণ আযান হলো মসজিদে অনুপস্থিতদের জন্য ঘোষণা, তাই এতে স্পষ্ট করে টেনে টেনে দেওয়া অধিক ফলপ্রসূ। আর ইকামত দ্রুত বলবে; কারণ তা উপস্থিতদের জন্য ঘোষণা, সুতরাং এতে তাজবীদ মেনে দ্রুত দ্রুত বলাই সমীচীন।^২

১২- শরিয়তের বিধান অনুযায়ী সহজ-সরল ও স্বাভাবিক কণ্ঠে আযান দেবে, কৃত্রিমতা বা গানের সুর বর্জন করবে এবং উদ্দেশ্য ব্যাহত হয় এমন দীর্ঘ করবে না; বরং মুয়াজ্জিদ এর শরয়ি শর্ত ও আদবসমূহ রক্ষা করে নিজ কণ্ঠে তা আদায় করবে।

১ হাদীসটি বুখারী (৬৩৪) ও মুসলিম (৫০৩) বর্ণনা করেছেন। হাদীসের শব্দাবলী ইমাম মুসলিমের।

২ দেখুন: আল-মুগনী, ইবনু কুদামাহ (১/২৯৫)।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: আযান ও ইকামতের পদ্ধতি

আযান ও ইকামতের কয়েকটি পদ্ধতি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর আযানের পদ্ধতির বর্ণনায় যে সমস্ত দলীল এসেছে, তার মধ্যে হল আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর হাদীস, এবং তাতে বর্ণিত আযানের শব্দাবলী হলো:

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।(আল্লাহই সুমহান)

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তথা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই।

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, তথা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

হাইয়া আলাস স্বলাহ, হাইয়া আলাস স্বলাহ, তথা এসো সালাতের দিকে, এসো সালাতের দিকে।

হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ। তথা সফলতার দিকে এসো, সফলতার দিকে এসো।

আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।(আল্লাহই সুমহান)

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তথা আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই।

আর ইকামতের শব্দাবলী হল:

আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার।(আল্লাহই সুমহান)

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তথা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য ইলাহ নেই।

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, তথা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল

হাইয়া আলাস স্বলাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, তথা এসো সালাতের দিকে, এসো কল্যাণের দিকে।

কদ ক্বমাতিস সালাহ (قد قامت الصلاة), কদ ক্বমাতিস সালাহ (قد قامت الصلاة) ।

আল্লাহ্ আকবার, আল্লাহ্ আকবার।(আল্লাহই সুমহান)

“লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ”, অর্থ: “আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মাবুদ নেই।”¹

এটিই হলো আযান ও ইকামাতের সেই পদ্ধতি, যার ওপর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অবস্থানকালে ও সফরকালে, তার মৃত্যু পর্যন্ত অবিচল ছিলেন।

এবং ফজরের আযানে হাইয়া আলাল ফালাহ বলার পর ‘আস-সালাতু খায়রুম মিনান নাউম’ দুইবার বলবে; কেননা আবু মাহযুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন:

¹ আবু দাউদ, হাদীস নং (৪৯৯) ও তিরমিযী, হাদীস নং (১৮৯) সংক্ষীপ্তভাবে; এবং তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

«فَإِنْ كَانَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ»

আর ফজরের সালাত হলে তুমি বলবে: আস-সালাতু খায়রুম মিনান নাউম, আস-সালাতু খায়রুম মিনান নাউম।¹

আযানের আরেকটি পদ্ধতি হলো তারজী' বা পুনরাবৃত্তি করা। আর তা হলো, শাহাদাতাইন(দুই সাক্ষের বাক্য) প্রথমে নিচু স্বরে বলা, অতঃপর উঁচু স্বরে তা পুনরায় বলা। আর ইকামাতের ক্ষেত্রে এর বাক্যগুলো দুইবার করে বলা। এই পদ্ধতিটি আবু মাহযূরাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং আমাকে আযান শিখিয়েছেন এবং বলেছেন:

«قُلْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ - قَالَ: ثُمَّ ارْجِعْ، فَمَدَّ صَوْتَكَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

“বলো: ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু

¹ আবু দাউদ, হাদীস নং (৫০০); "খুলাসাতুল আহকাম" (১/২৮৬)-তে ইমাম নববী একে হাসান বলেছেন।

আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’। অতঃপর পুনরায় উচ্চস্বরে বলবে: ‘আশহাদু আল লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়্যা আলাস সলাহ, হাইয়্যা আলাস সলাহ। হাইয়্যা ‘আলাল ফালাহ, হাইয়্যা ‘আলাল ফালাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ”।

«وَالْإِقَامَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

“আর ইকামত হলো: ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়্যা আলাস সলাহ, হাইয়্যা আলাস সলাহ। হাইয়্যা ‘আলাল ফালাহ, হাইয়্যা ‘আলাল ফালাহ। ক্বাদ ক্বামাতিস সলাহ, ক্বাদ ক্বামাতিস সলাহ। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’।”

আর এটি হলো বৈচিত্র্যময় পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত, তাই মুয়াজ্জিন এসব প্রমাণিত পদ্ধতির যেকোনো একটি গ্রহণ করলে তা উত্তম। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহিমাল্লাহু আযানের কিছু প্রমাণিত পদ্ধতি উল্লেখ করার পর বলেন: আর যখন ব্যাপারটি এমনই, তখন আহলে হাদীস এবং যারা তাদের সাথে একমত, তাদের মতই সঠিক। আর তা হলো, এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু প্রমাণিত হয়েছে, তার সবগুলোকে বৈধ মনে করা। তারা এর কোনোটিকেই অপছন্দ করেন না। কারণ আযান ও ইকামতের পদ্ধতির বৈচিত্র্য হলো কিরাত, তশাহহুদ ও এ জাতীয় অন্যান্য বিষয়ের পদ্ধতির বৈচিত্র্যের মতোই। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের জন্য যা সুন্নাত হিসেবে প্রবর্তন করেছেন, তা অপছন্দ করার ইখতিয়ার কারো নেই।^১

সপ্তম অনুচ্ছেদ: আযান শ্রবণকারী যা বলবে, এবং এর পরে যে দু'আ করবে

যে ব্যক্তি আযান শুনবে তার জন্য মুস্তাহাব হল মুয়াজ্জিন যা বলে তা-ই বলা; কেননা আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»

^১ মাজমুউল ফাতাওয়া: (২২/৬৬)।

“যখন তোমরা আযান শুনতে পাও তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরাও অনুরূপ বল।” তবে দুই ‘হাই’আলা..’ এর সময় ছাড়া- আর তা হলো মুয়াজ্জিনের উক্তি: হাইয়া আলাস সলাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ- এ ক্ষেত্রে আযান শ্রবণকারীর জন্য মুস্তাহাব হলো:¹

«لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»

লা হাউলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, তেথা “আল্লাহর তাওফীক ব্যতীত ভালো কাজ করার সামর্থ্য ও খারাপ থেকে বিরত থাকার কোনো শক্তি নেই।”) বলা। ‘উমার বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু-এর এই হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ»

“মুয়াজ্জিন যখন ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’ বলে, তখন তোমাদের কেউ তার জবাবে বলে: ‘আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার’। অতঃপর মুয়াজ্জিন যখন বলে: ‘আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’, এর জবাবে সে বলে: ‘আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ’। অতঃপর মুয়াজ্জিন যখন বলে: ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার

¹ সহীহ বুখারী (৬১১), সহীহ মুসলিম (৩৮৩)।

রাসূলুল্লাহ', এর জবাবে সে বলে: 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'। অতঃপর মুয়াজ্জিন যখন বলে: 'হাইয়্যা আলাস সলাহ', এর জবাবে সে বলে: 'লা-হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। অতঃপর মুয়াজ্জিন যখন বলে: 'হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ', এর জবাবে সে বলে: 'লা-হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। অতঃপর মুয়াজ্জিন যখন বলে: 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার', এর জবাবে সে বলে: 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'। অতঃপর মুয়াজ্জিন যখন বলে: 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', এর জবাবে সে তার অন্তর থেকে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলে, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।"¹

এবং সে বলবে: (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমি আল্লাহকে আমার রব হিসেবে, মুহাম্মাদকে রাসূল হিসেবে, এবং ইসলামকে আমার দ্বীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট।) শাহাদাতাইন(দুই সাক্ষের)-এর পর।

সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيَ اللَّهُ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا؛ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ» [38].

¹ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৩৮৫)

“যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আযান শুনে বলে: ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসুল। আমি সন্তুষ্ট আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে পেয়ে এবং ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে’, তার গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।”^১

আর মুয়াজ্জিন ফজরের আযানে যখন আস সালাতু খাইরুম মিনান নাওম বলে তখন শ্রোতাও তার অনুরূপ বলবে; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ»

“যখন তোমরা আযান শুনে পাও তখন মুয়াজ্জিন যা বলে তোমরাও অনুরূপ বল।”^২

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ করবে। অতঃপর হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তা বলবে:

«مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ النَّائِمَةِ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، أَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“যে ব্যক্তি আযান শুনে এই দু’আ বলবে: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ النَّائِمَةِ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، أَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ

১ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৩৮৬)

২ মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি।

مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ (হে আল্লাহ এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও প্রতিষ্ঠিত সালাতের তুমিই রব! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তুমি জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান ও মর্যাদা দান করো এবং তাকে সেই প্রশংসিত স্থানে পৌঁছাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছো)। তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ অনিবার্য হয়ে যাবে।”, এর বাক্য:¹

«الدَّعْوَةُ الثَّامَّةُ»

“পরিপূর্ণ দা‘ওয়াত” এর অর্থ হল, অর্থাৎ: আযানের দা‘ওয়াত, তা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ; কারণ এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর মহত্ত্ব ও তাঁর তাওহীদ, রিসালাতের সাক্ষ্য এবং কল্যাণের দিকে আহ্বান।

«وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ»

“আর প্রতিষ্ঠিত সালাত।” অর্থাৎ: যা কায়েম করা হবে এবং সম্পাদন করা হবে।

«الْوَسِيلَةُ»

“ওয়াসিলা” অর্থ হল: জান্নাতের একটি বিশেষ মর্যাদা।

«الْفَضِيلَةُ»

“ফযীলত” এর অর্থ হল: সেই উচ্চ মর্যাদা যাতে অন্য কেউ শরীক নয়।

«مَقَامًا مَحْمُودًا»

¹ সহীহ বুখারী হাদীস নং (৬১৪), জাবির রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

“প্রশংসিত স্থান” প্রশংসিত স্থান হল: এমন প্রতিটি স্থান মানুষ যার প্রশংসা করে। আর এর অন্তর্ভুক্ত হলো সকল সৃষ্টির জন্য সেই সবচেয়ে বড় সুপারিশ, যা তিনি হাশরের ময়দানে অবস্থানকারীদের মাঝে ফয়সালা করার জন্য করবেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন:

«إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَن صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ، حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»

“তোমরা যখন মুয়াজ্জিনকে আযান দিতে শুন, তখন সে যা বলে তোমরা তাই বল। অতঃপর আমার ওপর দরুদ পাঠ কর। কেননা, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ তা’আলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওসীলা প্রার্থনা কর। কেননা, ওসীলা জান্নাতের একটি সম্মানজনক স্থান। এটা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজনকেই দেয়া হবে। আমি আশা করি, আমিই হব সে বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আমার জন্যে ওসীলা প্রার্থনা করবে তার জন্যে (আমার) শাফাআত আবশ্যক হয়ে যাবে”।¹

1 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৩৮৪)

আর আযানের ক্ষেত্রে সংযোজিত বিদআতসমূহের অন্তর্ভুক্ত হল: আজানের পর মুয়াজ্জিনের উচ্চকণ্ঠে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত ও সালাম পাঠ করা, অনুরূপভাবে আযানের পর বর্ণিত যিকুর— (আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত তাম্মাহ ...) সম্মিলিতভাবে পাঠ করা, এবং দুআ করার সময় দুই হাত উত্তোলন করা, মুয়াজ্জিনের সাথে উত্তর দানকারী ব্যক্তির শেষ বাক্যে (হাক্কান) বা (আবাদান) শব্দ অতিরিক্ত যোগ করে (হাক্কান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বা (আবাদান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) বলা; কারণ এগুলোর কোনো দলীল নেই।

অষ্টম অনুচ্ছেদ: আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার হুকুম

আযানের পর সালাত আদায় করা পর্যন্ত পুরুষের জন্য মসজিদ থেকে বের হওয়া হারাম। তবে ওযরগ্রস্ত হলে অথবা মসজিদে ফিরে আসার নিয়ত করলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এ মর্মে আবুস সা'ছা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে মসজিদে বসে ছিলাম। (এমন সময়) মুয়াজ্জিন আযান দিল। তখন এক লোক মসজিদ থেকে চলে যেতে লাগল। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তার মসজিদ থেকে বের হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, জেনে রেখো 'এই লোকটি আবুল

কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানি করল।^১

ইমাম তিরমিযী তার সুনান গ্রন্থে এই হাদীসটি বর্ণনা করার পরে বলেছেন: “ওযু না থাকা বা কোনো অপরিহার্য কাজের মতো ওযর ব্যতীত আযানের পর মসজিদ থেকে বের না হওয়াই হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ ও তাদের পরবর্তী আহলে ইলমদের আমল।”^২

নবম অনুচ্ছেদ: আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময় কতটুকু?

সুন্নাহে এমন বর্ণনা এসেছে যা প্রমাণ করে যে, আযান ও ইকামাতের মাঝে যথেষ্ট সময় ছিল; আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ»

“প্রত্যেক আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে। প্রত্যেক আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে। তারপর তৃতীয়বার বললেন: “যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে-তার জন্য”। দুটি আযান বলতে বোঝায়: আযান ও ইকামাত। এজন্য মুয়াজ্জিন তার আযান ও ইকামাতের মাঝে কিছুটা সময় রাখবে, যাতে উপস্থিত

১ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৬৫৫)

২ সুনানুত তিরমিযী: (১/৩৯৭), হাদীস নং (২০৪)।

ব্যক্তিগণ সালাতের পূর্বে দুই রাকাত সালাত আদায় করতে পারে এবং মসজিদের মুসল্লীগণ এসে সালাতে অংশগ্রহণ করতে পারে।^১

ইমাম আহমাদ বলেন: “মুয়াজ্জিনের উচিত, আযান দেওয়ার পর ইকামাত দিতে তাড়াহুড়া না করা। সে অপেক্ষা করবে, যাতে মসজিদের মুসল্লীগণ আসতে পারে এবং প্রয়োজনগ্রস্ত ব্যক্তি—(যিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে চান) তার প্রয়োজন সেরে নিতে পারে। সে তার আযান ও ইকামাতের মাঝে কিছুটা অবকাশ রাখবে”।^২

দশম অনুচ্ছেদ: মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব-কর্তব্য ও আদব

মুয়াজ্জিনের উচিত তার আযান দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি কামনা করা; এর প্রমাণ উসমান ইবন আবিল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর হাদীস, তিনি বলেন:

«إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهْدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ اتَّخَذَ مُؤَدِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَدَانِهِ أَجْرًا» [46].

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সর্বশেষ যে ওয়াসিয়ত করেন, তার মধ্যে এটিও যে, আমি

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৬২৭), মুসলিম, হাদীস নং (৮৩৮)।

২ শারহ উমদাতিল ফিকহ, ইবনে তাইমিয়া, কিতাবুস সালাত: (পৃ: ১৩৫)।

যেন এমন একজন মুয়াজ্জিন নিয়োগ করি যে তার আযানের বিনিময় গ্রহণ করবেন।”^১

তিরমিযী রাহিমাহুল্লাহ এই হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন: “এই হাদীসের উপরই আলেমগণের আমল, তারা মুয়াজ্জিনের আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করাকে অপছন্দ করেছেন এবং মুয়াজ্জিনের জন্য তার আযানে সাওয়াবের আশা রাখাকে উত্তম মনে করেছেন।”

আর মুসলিমদের বাইতুল মাল থেকে মুয়াজ্জিনকে প্রদানে কোনো অসুবিধা নেই; কারণ বাইতুল মাল কেবল মুসলিমদের কল্যাণের জন্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, এবং আযান ও ইকামাত মুসলিমদের কল্যাণকর কাজের অন্তর্ভুক্ত।^২

আর তার জানা ওয়াজিব যে, তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আযান যথাসময়ে দেওয়ার ব্যাপারে দায়িত্বশীল; কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ»

“ইমাম জিন্মাদার, আর মুয়াজ্জিন আমানতদার।” অর্থাৎ তিনি সালাতের সময়সমূহের ব্যাপারে আমানতদার। সুতরাং তার উপর আবশ্যিক হলো, আযানের সময়ের যথেষ্ট পূর্বে পবিত্র হয়ে মসজিদে আসা এবং কোনো ওযর ছাড়া আযান থেকে অনুপস্থিত

^১ তিরমিযী: হাদীস নং (২০৯), তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

^২ দেখুন: আল-কাহতানীর আযান ও ইকামাত: (পৃ. ১৯)।

না থাকা। ওযর থাকলে তার কর্তব্য হলো, আযানের জন্য কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করা।^১

মুয়াজ্জিনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পালন করা উচিত:

(১) মসজিদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুরক্ষার প্রতি যত্নবান হওয়া এবং এ ব্যাপারে মসজিদের কর্মী ও মুসল্লিদের সাথে সহযোগিতা করা; কেননা, আল্লাহ তাঁর ঘরসমূহ আবাদকারীদের প্রশংসা করে বলেন:

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ 18

“তরাই তো আল্লাহ্র মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।” [আত-তাওবাহ: ১৮] চাই সেগুলোর আবাদ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে হোক, কিংবা তাতে সালাত কায়েম ও আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে হোক, আবাদ দ্বারা উভয় অর্থই উদ্দেশ্য।^২

(২) সঠিক আকীদা এবং আযান, তাহরাত ও সালাতের আহকাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে, আল্লাহ তা‘আলার কিতাব থেকে যথেষ্ট পরিমাণ মুখস্থ

১ আবু দাউদ: হাদীস নং (৫১৭), তিরমিযী: হাদীস নং (২০৭), আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

২ দেখুন: ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার: ১/৫৪১।

করবে এবং ইমাম সালাতে অনুপস্থিত থাকলে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার যোগ্য হতে হবে।

(৩) সৎকাজের আদেশ দেওয়া, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা এবং হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার দিকে আহ্বান করবে; মানুষের প্রতি কোমল হবে, তাদের কষ্টে ধৈর্য ধারণ করবে এবং এ বিষয়ে মসজিদের ইমামের সাথে সহযোগিতা করবে।

(৪) মসজিদকে ইলম, ইবাদত ও মুসল্লীদের জন্য কল্যাণকর কাজে সীমাবদ্ধ রাখবে এবং তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য ক্ষতিকর সকল বিষয় পরিহার করবে।

(৫) মসজিদের জামাত ও মুসল্লিদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখবে ও পরস্পরকে সহযোগিতা করবে; তারা অনুপস্থিত থাকলে তাদের খোঁজ-খবর নিবে, তাদের অসুস্থদের দেখতে যাবে, তাদের জানাযার সালাত আদায় করবে ও তাতে অংশগ্রহণ করবে এবং বিপদ-আপদে তাদের পাশে দাঁড়াবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: ইমামতির বিধি-বিধান

প্রথম অনুচ্ছেদ: ইমামতির সংজ্ঞা

সালাতে ইমামতি হল: মুসল্লিদের মধ্য থেকে কোনো এক ব্যক্তির এগিয়ে যাওয়া; যাতে তারা সালাতে তার অনুসরণ করে। আর সালাতের ইমাম হলেন: তিনি, যাকে মানুষেরা তাদের সালাতে অনুসরণ করে থাকে।^১

^১ দেখুন: হাশিয়াতুর রওদিল মুরবি: (২/ ২৯৬), আল-ইমামাহ ফিস সালাত লিলকাহতানী: (পৃ. ৬)

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ইমামতের শরয়ী বিধান ও ফযীলত

সালাতে ইমামতি করা সর্বোত্তম আমলসমূহের অন্যতম, যা ইলম, কিরাআত, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি উত্তম গুণাবলীর অধিকারী সর্বোত্তম ব্যক্তিগণই আঞ্জাম দিয়ে থাকেন, যেমনটি পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। ইমামতি ছাড়া জামা'আতে সালাত আদায় করা কল্পনা করা যায় না, আর জামা'আতে সালাত আদায় করা ইসলামের একটি অন্যতম বড় নিদর্শন।^১

ইমামতির ফযীলতসমূহের অন্যতম হল:

১। ইমামত-এর ফযীলত সুবিদিত। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার খুলাফায়ে রাশিদাহ এ দায়িত্বে পালন করেছেন। আর যুগে যুগে ইলম ও আমলের দিক থেকে মুসলিমদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তিগণই এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন।^২

২- সালাতে ইমামতি একটি ফযীলতপূর্ণ শর'ঈ দায়িত্ব, যা মর্যাদাবান ব্যক্তিগণই পালন করে থাকেন; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأُ لَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ...»

“জামাআতের ইমামতি ঐ ব্যক্তি করবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কুরআন পড়তে জানে...” আর এটি

১ দেখুন: আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়াহ আল-কুয়েতিয়াহ: (৬/ ২০১)।

২ দেখুন: আল-ইমামাহ ফিস সালাত লিল-কাহতানী: (পৃ. ৯)।

সুবিদিত যে, উত্তম ক্বারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; তাই তার সাথে এটিকে যুক্ত করা এর শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচায়ক।¹²

৩- ইমামদের সঠিক পথের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া; আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«الإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ ارْشِدِ الْأَيْمَةَ، وَاعْفِرِ لِلْمُؤَدِّينَ»

“ইমাম হলেন যিম্মাদার এবং মুয়াজ্জিন হলেন আমানতদার। হে আল্লাহ! আপনি ইমামগণকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং মুয়াজ্জিনগণকে ক্ষমা করুন।”³

আর, “ইমাম জিম্মাদার” এর অর্থ: অর্থাৎ (তিনি) মুক্তাদিদের সালাতের শুদ্ধতার যিম্মাদার; কারণ তাদের সালাত তার সালাতের সাথে সম্পর্কিত। আর হে আল্লাহ, আপনি ইমামদেরকে সঠিক পথ দেখান। এর অর্থ হলো: অর্থাৎ তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, যাতে তারা সর্বোত্তম অবস্থায় সালাত আদায় করতে পারে।⁴

1 দেখুন: আশ-শারহুল মুমতি' আলা যাদিল মুসতাকনি' (২/৪১)।

2 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৬৭৩), আবু মাসউদ আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

3 আবু দাউদ, হাদীস নং (৫১৭), তিরমিযী, হাদীস নং (২০৭)

4 দেখুন: আল-আইনী'র শরহে আবী দাউদ, (২/৪৬৮) এবং আল-মুনাব্বীর ফয়জুল কাদীর, (৩/১৮২)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ইমামতির অধিক হকদার কে

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামাতের জন্য অধিক হকদার ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا - وَفِي رَوَايَةٍ: سِنًا - وَلَا يُؤْمَنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ»

“জামা‘আতের ইমামতি ঐ ব্যক্তি করবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কুরআন পড়তে জানে। যদি তারা পড়াতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ (হাদীস) বেশী জানে সে (ইমামতি করবে)। অতঃপর তারা যদি সুন্নাহ জানার ক্ষেত্রে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে হিজরতকারী। যদি হিজরতের ক্ষেত্রে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি ইমামতি করবে।-এবং অন্য বর্ণনায়: বয়সের দিক থেকে যে বড় সে ইমামতি করবে। আর কোন ব্যক্তি যেন অন্য কোন ব্যক্তির নেতৃত্ব স্থলে ইমামতি না করে।” অতএব, ইমামতের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ও হকদার ব্যক্তিগণ নিম্নরূপ:^১

১- যিনি সবচেয়ে বেশি কুরআন মুখস্তকারী, সবচেয়ে সুন্দর ও বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারী, আর সে হল এমন

১ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৬৭৩)।

ব্যক্তি যে কুরআন আয়ত্ব করেছে এবং তা সর্বোত্তমভাবে আদায় করতে পারে ও সালাতের ফিকহ সম্পর্কে জ্ঞানী। সুতরাং যদি একজন অধিক সুন্দর তিলাওয়াতকারী এবং অন্যজন তার চেয়ে কম সুন্দর তিলাওয়াতকারী কিন্তু ফিকহ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত ব্যক্তি একত্রিত হন, তাহলে যে কারী ফকীহ নন তার উপর ফকীহ কারীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কারণ, সুন্দর তিলাওয়াতের প্রয়োজনের চেয়ে সালাত ও তার আহকামের ফিকহের প্রয়োজন অনেক বেশি।

২- অতঃপর সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি। সুতরাং যদি পড়াতে সমান দুইজন ইমাম থাকেন, কিন্তু তাদের একজন অধিক ফিকহবিদ এবং সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী হন, তাহলে অধিক ফিকহবিদকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمُ بِالسُّنَّةِ»

যদি তারা ক্বিরাতের ক্ষেত্রে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ (হাদীস) বেশী জানে সে (ইমামতি করবে)।

৩- অতঃপর কুফরের দেশ থেকে ইসলামের দেশে হিজরতের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ব্যক্তি, যদি তারা ক্বিরাআত ও সুন্নাহর জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমান হয়; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً»

“অতঃপর তারা যদি সুন্নাহর জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে হিজরতকারী।”

৪- অতঃপর ইসলাম গ্রহণে যিনি আগ্রগামী, যদি তারা হিজরতের ক্ষেত্রে সমান হয়; (ব্যক্তি ইমামতি করবে) কেননা পূর্বোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا»

“যদি হিজরতে সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে যে সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করছে সে।” অর্থাৎ: ইসলাম কবুল করার ক্ষেত্রে আগ্রগামী ব্যক্তি।

৫- তারপর বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, যদি তারা উভয়ে পূর্ববর্তী সকল বিষয়ে সমান হয়; কারণ, পূর্বোক্ত হাদীসের একটি বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا»

“অতঃপর তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি” এবং মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«فَلْيُؤَدِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّمْ أَكْثَرُكُمْ»

“তোমাদের মধ্যে একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।”^১

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৬২৮), মুসলিম, হাদীস নং (৬৭৪)।

এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়সে বড় ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন; কারণ তারা জ্ঞানের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের ছিলেন।

সুতরাং, যখন তারা পূর্বে উল্লিখিত সকল বিষয়ে সমান হয় এবং ইমামতির জন্য তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়— প্রত্যেকেই ইমাম হতে চায়, তখন তাদের মধ্যে লটারি (কুরআ) করা হবে। অতঃপর লটারিতে যে জয়ী হবে, তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; কারণ, তারা উভয়েই হকদার হওয়ার দিক থেকে সমান এবং উভয়কে একত্রে ইমাম বানানো সম্ভব না হওয়ায় অন্যান্য অধিকারের মতোই তাদের মধ্যে লটারি করা হবে।

বাড়ির মালিক তার মেহমানের চেয়ে ইমামতির অধিক হকদার এবং অনুরূপভাবে শাসক (যিনি সর্বোচ্চ ইমাম) অন্যদের চেয়ে ইমামতির অধিক হকদার, যদি তাদের প্রত্যেকেই ইমামতির যোগ্য হন; কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَا يُؤَمَّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ»

“কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পরিবারে এবং তার কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলে ইমামতি করবে না।”

আর তাদের উভয়ের মতোই হলেন মসজিদের নিয়োগকৃত ইমাম; তিনি অন্যদের চেয়ে অধিক হকদার—শাসক ব্যতীত—যদিও তার চেয়ে অন্য কেউ অধিক কারী ও জ্ঞানী হয়; পূর্ববর্তী হাদীসের ব্যাপক অর্থের কারণে।

ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমাৰ একজন আযাদকৃত গোলাম একটি মসজিদে সালাত আদায় কৰতেন, অতঃপর তিনি সেখানে উপস্থিত হলে তার গোলাম তাকে সামনে এগিয়ে দিতে চাইল, তখন ইবনু উমার তাকে বললেন: “তুমি তোমার মসজিদে ইমামতিৰ অধিক হকদার।”^১

কেননা, তার উপর অন্যকে প্ৰাধান্য দিলে তার অধিকারে হস্তক্ষেপ কৰা হয় এবং তার মনঃক্ষুণ্ণ কৰা হয়।

জ্ঞানবান নাবালেগের ইমামতি কৰা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কিছু আলেম আমর ইবন সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহুৰ হাদীসের কাৰণে তা জায়েয বলেছেন।

«أَنَّهُ أَمَّ قَوْمَهُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ سِنِينَ» [60].

“তিনি ছয় বা সাত বছর বয়সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তার কওমের ইমামতি কৰেছেন।”^২

নফল সালাত আদায়কাৰী ব্যক্তির ইমামতি ফরয আদায়কাৰীৰ জন্য সহীহ হবে, মু‘আয ইবনু জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীসের ভিত্তিতে।

^১ শাফেয়ী (রহ.), ‘আল-উম্ম’ গ্রন্থে (১/১৮৫); আব্দুর রাযযাক (রহ.), ‘আল-মুসান্নাফ’ গ্রন্থে (২/৩৯৯); এবং বাইহাকী (রহ.) (৩/১২৬) (৫৫৩১)। ইমাম নববী (রহ.) ‘আল-খুলাসাহ’ (২/৭০১)-তে বলেছেন: এর সনদ হাসান অথবা সহীহ। আর শাইখ আলবানী (রহ.) ‘ইরওয়াউল গালীল’ (২/৩০২)-এ এর সনদকে হাসান বলেছেন।

^২ হাদীসটি বুখারী বর্ণনা কৰেছেন: (৪৩০২)।

«أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ تِلْكَ الصَّلَاةَ» [61].

“তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এশার সালাত আদায় করতেন, তারপর ফিরে গিয়ে তার সম্প্রদায়কে নিয়ে সেই সালাত আদায় করতেন।”^১

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: যাদের ইমামতি হারাম:

নিম্নোক্ত অবস্থায় ইমামতি হারাম:

১- পুরুষের জন্য নারীর ইমামতি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর ব্যাপকতার কারণে:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»

“সে জাতি কখনোই সাফলকাম হবে না, যারা তাদের কর্তৃত্ব কোনো নারীর ওপর অর্পণ করে।”, আর ইমামতি এক প্রকারের কর্তৃত্ব এবং যেহেতু তাদের জন্য শেষ কাতারসমূহে থাকাই মূলনীতি, যেমনটি সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে; আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:^২

«خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»

“পুরুষদের কাতারের মধ্যে সর্বোত্তম কাতার হল প্রথম কাতার, আর নিকৃষ্টতম কাতার হল শেষ কাতার। আর

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৭০১), সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৪৬৫)।

২ হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন: (৪৪২৫), আবু বাকরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে।

মহিলাদের কাতারের মধ্যে সর্বোত্তম কাতার হল শেষ কাতার আর নিকৃষ্টতম কাতার হল প্রথম কাতার।” আর এটি তার সুরক্ষা ও পর্দার জন্য। সুতরাং যদি তাকে ইমামতির সুযোগ দেয়া হয়, তবে তা এই শর’ঈ মূলনীতির বিরোধী হয়ে যাবে। আর আলিমগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। ইমাম ইবনু হাযম রাহিমাল্লাহ বলেন:^১ এবং তারা এ ব্যাপারে একমত যে, কোনো নারী পুরুষদের ইমামতি করতে পারে না, যখন তারা জানে যে সে একজন নারী। তারপরও যদি তারা তা করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের সালাত ফাসিদ হয়ে যাবে।^২

২- কোনো ব্যক্তি অপবিত্র বা নাপাকীযুক্ত অবস্থায় আছে জেনেও তার ইমামতি করা; তবে মুকতাদীগণ যদি সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত এ ব্যাপারে অবগত না থাকে, উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত বর্ণনার ভিত্তিতে, তাদের সালাত সহীহ হয়ে যাবে।

«أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَعَادَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا» [65].

“তিনি নাপাক অবস্থায় মুকতাদীগণকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন, অতঃপর তিনি পুনরায় সালাত আদায় করলেন কিন্তু তাদেরকে পুনরায় সালাত আদায়ের নির্দেশ দেন নি।”^৩

১ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৪৪০)।

২ মারাতিবুল ইজমা: (পৃ. ২৭).

৩ সুনানে দারা কুতনী, হাদীস নং (১৩৭১)।

আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী রাহিমাল্লাহ বলেছেন:
 “এটাই সর্বসম্মত মত: নাপাক ব্যক্তি পুনরাবৃত্তি করবে
 কিন্তু অন্যরা পুনরাবৃত্তি করবে না, এ বিষয়ে কোনো
 মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই”।^১

৩- এমন ব্যক্তির ইমামতি, যার সূরা ফাতিহা মুখস্থ
 নেই, অথবা তা শুদ্ধভাবে পড়তে পারে না, অথবা তাতে
 এমন কোনো হরফ অন্য হরফের সাথে মিলিয়ে পড়া যা
 করা যায় না, যেমন কেউ আল্লাহ তা‘আলার এ বাণীতে
 ‘হা’-কে ‘রা’-এর সাথে মিলিয়ে:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(সকল প্রশংসা সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহর প্রাপ্য।)

[আল-ফাতিহা: ২] কারণ সে অক্ষরকে তার অনুরূপ বা
 নিকটবর্তী নয় এমন অক্ষরের সাথে মিলিয়ে পড়েছে,
 অথবা এক অক্ষরকে অন্য অক্ষর দ্বারা পরিবর্তন করে,
 যেমন ‘রা’-কে ‘ইয়া’ দ্বারা পরিবর্তন করা, কিংবা এমন
 ভুল করা যা অর্থ পরিবর্তন করে দেয়, তাহলে তার
 ইমামতি তার মতো ব্যক্তিদের ক্ষেত্র ছাড়া শুদ্ধ হবে না;
 সালাতের রুকন আদায়ে তার অক্ষমতা বা তাতে ত্রুটি
 করার কারণে।

৪- এমন বিদ‘আতীর ইমামতি, যাকে তার
 বিদ‘আতের কারণে কাফের বলা হয়; আল্লাহ তা‘আলা
 বলেছেন:

^১ সুনানে দারাকুতনী, (২/ ১৮৮)।

﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ۚ﴾ 18

﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ۚ﴾ 18

“সুতরাং যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি তার ন্যায়, যে ফাসেক? তারা সমান নয়।” [আস-সাজদাহ: ১৮] আর এখানে ফাসিক হলো কাফির, যেমনটি আয়াতসমূহের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয়।

৫- যে মাসজিদে নিয়োজিত ইমাম রয়েছে, সেখানে তার অনুমতি, অথবা তার বিলম্ব ও ওয়াক্ত সংকীর্ণ হওয়া ব্যতীত তার পূর্বে অন্য কারো ইমামতি করা বিশুদ্ধ হবে না।^১

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: যাদের ইমামতি মাকরুহ

যাদের ইমামতি করা মাকরুহ:

১- লাহ্‌হান: যিনি কিরাআতে অর্থ পরিবর্তন হয় না এমন ভুল অধিক পরিমাণে করেন, তা সূরা ফাতিহাতে হোক বা অন্য কোথাও। যেমন, (الْحَمْدُ لِلَّهِ) এর কে যবর দিয়ে (الْحَمْدُ لِلَّهِ) পড়লে তার সালাত সহীহ, তবে তার ইমামতি মাকরুহ; কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَأُ لَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»

“জামাআতের ইমামতি ঐ ব্যক্তি করবে, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল কুরআন পড়তে জানে।”^২

১ দেখুন: আল-আসইলাহ ওয়াল-আজওয়িবাহ আল-ফিকহিয়াহ লিসসালমান: (১/১৬৩)।

২ প্রাপ্ত।

আর যদি সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কোথাও ভুলবশত, অজ্ঞতাবশত অথবা জিহ্বার কোনো ত্রুটির কারণে এমন কোনো ভুল হয় যা অর্থ পরিবর্তন করে দেয়, তবে মাকরুহসহ তার ইমামতি শুদ্ধ হবে; কারণ সে যদি সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য কিছু পড়া ছেড়ে দিত, তবে তার ইমামতি শুদ্ধ হয়ে যেত, একইভাবে তাতে ভুল করলেও তা শুদ্ধ হবে। আর যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে তা করে, তবে সালাত বাতিল হয়ে যাবে; কারণ সে তার সালাতে খেল তামাশাকারী।

২- যে ব্যক্তি কিছু হরফ, যেমন ফা, তা বা অন্য কোনো হরফকে পুনরাবৃত্তি করে, কেননা সে কিরাতের মাঝে বৃদ্ধি করেছে।

৩- ফাসিক এবং এমন বিদ'আতী যে তার বিদ'আতের কারণে কাফির নয়।^১

৪- যে ব্যক্তি এমন কওমের ইমামতি করে, যাদের অধিকাংশই তাকে ন্যায্য কারণে অপছন্দ করে; এ বিষয়ে আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتَهُمْ أَدَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَرُؤُوسُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامٌ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارُهُونَ»

“তিন ব্যক্তির সালাত তাদের কান অতিক্রম করে না: পলাতক দাস, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে; এমন নারী,

১ দেখুন: কাশশাফুল কিনা: (১/৪৭৫) ও তৎপরবর্তী।

যে এমন অবস্থায় রাত কাটালো যে তার স্বামী তার ওপর অসন্তুষ্ট এবং এমন ইমাম, যাকে তার কওমের লোকেরা অপছন্দ করে।”^১

ইমাম তিরমিযী বলেছেন: আলেমদের একটি দল কোনো ব্যক্তির এমন কওমের ইমামতি করাকে অপছন্দ করেছেন, যারা তাকে অপছন্দ করে। তবে ইমাম যদি যালিম না হোন, তাহলে গুনাহ তার অপছন্দকারীদের উপর বর্তাবে। এ বিষয়ে আহমাদ ও ইসহাক বলেছেন: যদি একজন, দুইজন বা তিনজন তাকে অপছন্দ করে, তাহলে তাদের নিয়ে সালাত আদায় করতে কোনো সমস্যা নেই, যতক্ষণ না কওমের অধিকাংশ লোক তাকে অপছন্দ করে।^২

আর যদি তারা তাকে এ কারণে অপছন্দ করে যে, তিনি সালাতে সুন্নাহর অনুসরণে যত্নবান, তাই তাদেরকে নিয়ে মাসনূন সূরাসমূহ পড়েন এবং ধীর-স্থিরতার সাথে সালাত আদায় করেন, তবে তাদের কে নিয়ে তার ইমামতি মাকরুহ হবে না; কারণ তারা তাকে অন্যায়ভাবে অপছন্দ করেছে, সুতরাং তাদের এই অপছন্দ ধর্তব্য নয়। তার উচিত হবে তাদেরকে ওয়াজ-নসীহত করা, স্বরণ করিয়ে দেওয়া এবং তাদের মন জয় করার চেষ্টা করা; এবং সুন্নাহ মোতাবেক তাদের নিয়ে সালাত আদায় করা। আর আল্লাহ যখন তাদের মাঝে

^১ হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন (৩৬০) এবং বলেছেন: “এই সূত্রে হাদীসটি হাসান গরীব।”

^২ সুনানুত তিরমিযী: (২/১৯২)।

সম্প্রীতি স্থাপনের ব্যাপারে তার নিয়তের সততা সম্পর্কে জানবেন, তখন তিনি তার জন্য তা সহজ করে দেবেন।^১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: ইমাম ও মুক্তাদির স্থান

সুন্নাত হলো ইমাম মুক্তাদীগণের সামনে দাঁড়াবে এবং মুক্তাদীগণ দুই বা ততোধিক হলে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে; কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন তিনি সামনে দাঁড়াতেন এবং তাঁর সাহাবীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়াতেন, এবং বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত যে,

«أَنَّ جَابِرًا وَجَبَّارًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَفَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأَيْدِيهِمَا حَتَّى أَقَامَهُمَا خَلْفَهُ» [73].

“জাবির ও জাব্বার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর একজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডানে এবং অপরজন তাঁর বামে দাঁড়ালেন, যখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। অতঃপর তিনি তাদের উভয়ের হাত ধরে তাদেরকে তার পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।”^২

আর একজন পুরুষ মুক্তাদি হলে ইমামের ডান পাশে তার বরাবর দাঁড়াবে; কেননা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন:

^১ দেখুন: আশ-শারহুল মুমতি' আলা যাদিল মুসতাকনি': (৪/ ২৫৩)।

^২ সহীহ মুসলিম (৩০১০), জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের অংশ।

«قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ» [74].

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে দাঁড়ালেন, আমিও তার বামপাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার কান ধরে ঘুরিয়ে তার ডানপাশে দাঁড় করালেন।”¹

আর মহিলাগণ পুরুষদের কাতারের পিছনে থাকবেন, যেহেতু আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন:

«صَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمَ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا» [75].

“আমি এবং ইয়াতীম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে কাতারবদ্ধ হলাম, আর বৃদ্ধা আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন।”²

আর ইমাম কাতারের মাঝ বরাবর দাঁড়াতে, আল্লামা ইবনে বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “মসজিদের মাঝখানে ইমামের দাঁড়ানোই সুন্নাত। এটিই সেই কর্মগত সুন্নাত, যার উপর মুসলিমগণ আমল করে আসছেন।”³

তিনি আরো বলেন: কাতার শুরু হবে ইমামের নিকটবর্তী মধ্যখান থেকে, এবং প্রত্যেক কাতারের ডান দিক তার বাম দিকের চেয়ে অধিক উত্তম। আর

1 সহীহ বুখারী (৬৩১৬), মুসলিম (৭৬৩)

2 সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৩৮০), সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৬৫৮)।

3 শাইখ সাঈদ আল-কাহতানী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর থেকে ‘আল-ইমামাহ ফিস সালাত’ (পৃষ্ঠা: ৫৫) কিতাবে নকল করেন।

আবশ্যক হলো, আগের কাতারটি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নতুন কাতার শুরু না করা।

সপ্তম অনুচ্ছেদ: ইমামের অগ্রগামী হওয়া

মুক্তাদির উপর ওয়াজিব হলো, সে তার সালাতের কর্মসমূহ ইমামের পরে শুরু করবে এবং সেগুলোতে তার অনুসরণ ও অনুকরণ করবে। আর অনুসারী ও মুক্তাদির কাজ হলো, সে তার অনুসরণীয় ব্যক্তির চেয়ে এগিয়ে যাবে না, তার সাথে সাথেও করবে না, বরং তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে এবং তার পিছনে তার অনুরূপ কাজ করবে। এর দাবি হলো, কোনো অবস্থাতেই তার সাথে ভিন্নতা অবলম্বন করবে না; আর তা এজন্য যে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ، وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ»

“অনুসরণ করার জন্যেই ইমাম নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব, তোমরা তাঁর সাথে অনৈক্য করো না। যখন তিনি রুকু করে, তোমরাও তার পরেই রুকু কর। আর যখন তিনি বলেন, ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ’, তখন তোমরা বল, ‘রাব্বানা লাকাল হামদু’। আর যখন তিনি সাজদাহ করে, তোমরাও তার পরেই সাজদাহ কর। আর যখন তিনি বসে সালাত পড়েন, তোমরাও তখন সম্মিলিতভাবে বসে সালাত পড়। আর সালাতে কাতার

সোজা কর; কেননা, কাতার সোজা করা সালাতের অন্যতম সৌন্দর্য।”^১

আর সালাতের সকল রোকনে ইমামের অগ্রগামী হওয়া হারাম; এ মর্মে আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন, অতঃপর সালাত শেষ করে তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন:

«أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِصْرَافِ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي»

“হে লোকসকল, নিশ্চয় আমি তোমাদের ইমাম। সুতরাং তোমরা রুকু,সিজদা, দাঁড়ান এবং প্রস্থানের ক্ষেত্রে আমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ো না; কেননা আমি তোমাদেরকে আমার সামনে এবং আমার পেছন থেকেও দেখতে পাই।” - আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:^২

«أَمَّا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ جَمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ جَمَارٍ»

“তোমাদের কেউ যখন ইমামের আগে মাথা তোলে, তখন তার মনে কি ভয় হয় না যে, মহান আল্লাহ তার

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৭২২), সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৪১৭)।

২ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৪২৬)।

মাথা, গাধার মাথায় পরিণত করে দেবেন অথবা তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দেবেন?”^১

যে ব্যক্তি তার ইমামের পূর্বে তাকবীরে তাহরীমা বলে তার সালাত হবে না; কারণ এর শর্ত হলো, সে তা ইমামের পরে বলবে, আর তা তার হাতছাড়া হয়ে গেছে।

অষ্টম অনুচ্ছেদ: ইমামতি ও জামাত বিষয়ক বিবিধ বিধি-বিধান

পূর্বে আলোচিত বিধানসমূহ ব্যতীত ইমামতি ও জামা‘আত সংক্রান্ত আরো কিছু বিধান:

১. বিবেকবান ও দ্বীনসচেতনগণ ইমামের কাছাকাছি থাকা মুস্তাহাব: সুতরাং বুদ্ধিমান ও গুণী প্রাপ্তবয়স্কদের ইমামের পেছনে তার কাছাকাছি দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لِيَلْنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنَّهْيَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ»
“তোমাদের মধ্যে প্রাপ্তবয়সী ও বিবেকবানরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে, অতঃপর তাদের পরবর্তীগণ, অতঃপর তাদের পরবর্তীগণ।”^২

২- প্রথম কাতারে উপস্থিত হওয়ার প্রতি আগ্রহ: মুক্তাদিদের জন্য মুস্তাহাব হলো প্রথম কাতারের দিকে এগিয়ে যাওয়া ও এর প্রতি যত্নবান থাকা এবং এ ক্ষেত্রে

১ সহীহ বুখারী (৬৯১), ও মুসলিম (৪২৭)

২ সহীহ মুসলিম হাদীস নং (৪৩২), আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

পিছিয়ে থাকা থেকে সতর্ক থাকা; আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় সাহাবীদের মাঝে পিছিয়ে যাওয়া লক্ষ্য করে তাদেরকে বললেন:

«تَقَدَّمُوا فَأَتُمُوا بِي، وَلِيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخَّرَهُمُ اللَّهُ»

“সামনে এগিয়ে এসো ও আমার অনুসরণ কর এবং তোমাদের পরবর্তী কাতারের লোকেরা যেন তোমাদের অনুসরণ করে। আর একদল লোক সর্বদা পিছিয়ে যেতে থাকে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে পিছনে করে দেন।”

- আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:¹

«لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهْمُوا»

“লোকেরা যদি আযান দেওয়া ও সালাতের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফযীলত জানত, আর এ ফযীলত অর্জন করার জন্য লটারি ব্যতীত অন্য কোনো (বিকল্প) ব্যবস্থা না পেত তাহলে অবশ্যই তারা লটারিই করত।”, এবং²

«لَاسْتَهْمُوا عَلَيْهِ»

1 সহীহ মুসলিম হাদীস (৪৩৮)।

2 সহীহ বুখারী (হাদীস নং: ৬১৫), সহীহ মুসলিম (হাদীস নং: ৪৩৭)।

“তারা লটারি করে এর ফয়সালা করত।” অর্থ হল, তারা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে লটারি করত যে, তাদের মধ্যে কে প্রথম কাতারে দাঁড়াবে।

আর মহিলাদের জন্য শেষের দিকের কাতারে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। এ মর্মে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُولُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أُولُهَا»

“পুরুষদের কাতারের মধ্যে সর্বোত্তম কাতার হল প্রথম কাতার, আর নিকৃষ্টতম কাতার হল শেষ কাতার। আর মহিলাদের কাতারের মধ্যে সর্বোত্তম কাতার হল শেষ কাতার আর নিকৃষ্টতম কাতার হল প্রথম কাতার।” আর এই বিধানটি সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যখন তারা কোনো পর্দা ছাড়া পুরুষদের পেছনে সালাত আদায় করে। পক্ষান্তরে যদি তারা পুরুষদের থেকে পর্দাকৃত সালাতের স্থানে সালাত আদায় করে, তাহলে তারা প্রথম কাতার, এরপর ধারাবাহিকভাবে পরের কাতার পূর্ণ করবে।¹²

1 দেখুন: মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বায: (১২/ ১৯৬)।

2 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৪৪০)

৩- ইমামের উচিত সূরা ফাতিহা পাঠে তাড়াহুড়া না করা, বরং তিনি ধীরস্থিরভাবে পড়বেন, যাতে মুক্তাদি তা পড়ার সুযোগ পায়।^১

৪- কাতারের পিছনে পুরুষের একাকী সালাত শুদ্ধ নয়; কারণ ওয়াবেসাহ ইবন মা'বাদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি কাতারের পিছনে একা সালাত আদায় করলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সালাত পুনরায় আদায় করার নির্দেশ দিলেন।^২

নবম অনুচ্ছেদ: ইমামের পালনীয় সুন্নাতসমূহ

ইমামের উচিত ইমামতিতে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসারী হওয়া। এই সুন্নাতগুলোর মধ্যে অন্যতম হল:

১- তার সালাতকে অতিদীর্ঘ না করা এবং মানুষের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা। আর তা হলো, ইমাম তার সালাতে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে। সুতরাং ইমামের জন্য সালাতে এমনভাবে তাড়াহুড়া করা জায়েয নয় যে, মুক্তাদীগণ সালাতের রুকন ও ওয়াজিবগুলো আদায় করতে সক্ষম না হয়। আর তার কিরাত পাঠেও ধীরস্থিরতা অবলম্বন করবে, যাতে তার পিছনের মুসল্লীগণ তাদের সালাত পূর্ণ করতে সক্ষম হয়, আবৃ

১ দেখুন: সালিহ আলুশ শাইখ এর আল-মিনযার ফি বায়ানে কাসীর মিনাল আখতা'ইশ শা'ইয়াহ, পৃ. (৫৩)।

২ সুনানে তিরমিযী: (২৩০), এবং তিনি বলেছেন: ওয়াবিসার হাদিসটি হাসান হাদিস।

মাস'উদ আল-আনসারী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বললেন:

وَاللّٰهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ -يَعْنِي: صَلَاةِ الصُّبْحِ- مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِّمَّا يُطِيلُ بِنَاءً، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِّينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ»

আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ভোরের সালাত (অর্থাৎ ফজরের সালাত) থেকে পিছিয়ে থাকি। কারণ অমুক ব্যক্তি আমাদের নিয়ে খুব দীর্ঘ সালাত আদায় করেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কোনো উপদেশের মজলিসে সেদিনের চেয়ে বেশি রাগান্বিত হতে দেখিনি। অতঃপর তিনি বললেন, “নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যারা (মানুষের মনে) বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে-ই লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করবে, সে যেন সংক্ষেপ করে; কারণ তাদের মধ্যে দুর্বল, বয়স্ক ও প্রয়োজনগ্রস্ত লোকও থাকে”।^১

২- সালাতে প্রবেশের পূর্বে কাতার সোজা করা ও ফাঁকাগুলো পূরণ করার আদেশ করা; কেননা তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন এবং সালাত আদায়কারীদেরকে এর আদেশ দিতেন। নু'মান ইবন বাশীর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৯০)।

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسْتَوِي صُفُوفَنَا حَتَّى كَانَتْمَا يُسْتَوِي بِهَا الْقِدَاحُ، حَتَّى رَأَى
أَنَا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ، حَتَّى كَادَ يُكَيِّرُ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا
صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوَّنَ صُفُوفُكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ
وُجُوهِكُمْ»

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারসমূহ এমনভাবে সোজা করতেন, যেন তিনি তার দ্বারা তীর সোজা করছেন। যতক্ষণ না তিনি অনুভব করতেন যে, আমরা তার নিকট থেকে বিষয়টি বুঝে নিয়েছি। অতঃপর একদিন তিনি বের হয়ে (ইমামের জায়গায়) দাঁড়ালেন। এমনকি তিনি তাকবীর বলতে যাবেন, এমনতাবস্থায় তিনি একটি লোককে দেখলেন যে, তার বুক কাতার থেকে বের হয়ে আছে। তখন তিনি বললেন, “হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করবে, নচেৎ আল্লাহ তোমাদের চেহারা পরিবর্তন করে দিবেন।”¹

ইমাম নববী রাহিমাতুল্লাহ বলেছেন: ক্বাফ বর্ণে যের দিয়ে 'আল-কিদাহ' (الْقِدَاحُ) শব্দের অর্থ হলো তীরের কাঠ, যা চাঁছা ও মসৃণ করা হয়। এর অর্থ: কাতারগুলোকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সোজা করতেন, এমনকি তা দিয়ে যেন তীর সোজা করা যাবে; তা অত্যন্ত সোজা ও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়ার কারণে।²

1 সহীহ বুখারী (৭১৭) ও মুসলিম (৪৩৬)। হাদীসের শব্দাবলী ইমাম মুসলিমের।

2 ইমাম নববীর শারহ সহীহ মুসলিম: (৪/১৫৭)।

৩- তিনি তাদেরকে প্রথম কাতার, তারপর তার পরের কাতার পূর্ণ করার আদেশ দেবেন। যদি কোনো অপূর্ণতা থাকে, তবে তা যেন শেষ কাতারে হয়; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«أَلَا تَصِفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟»

“তোমরা কি ফেরেশতগণ যেভাবে তারা তাদের রবের নিকট সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান, তাদের ন্যায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পার না?” তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, কীভাবে তারা তাদের রবের নিকট সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়? তিনি বললেন:

«يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ»

“তারা প্রথম কাতারগুলো পূর্ণ করেন এবং কাতারে মিলেমিশে দাঁড়ায়।”^১

৪- সালাতে কিরাআতের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করা। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিরাআতের সাধারণ নিয়ম ছিল যে, তিনি ফজরে তিওয়ালে মুফাস্সাল, মাগরিবে কিসারে মুফাস্সাল এবং এশা, যুহর ও আসরে আওসাতে মুফাস্সাল থেকে তিলাওয়াত করতেন। এ মর্মে সুলাইমান ইবন ইয়াসার, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

^১ সহীহ মুসলিম (৪৩০), জাবির ইবনু সামুরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

«مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فُلَانٍ، قَالَ سَلِيمَانُ: كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْآخَرَتَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرَبِ بِقَصَارِ الْمُفْصَلِ، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسْطِ الْمُفْصَلِ، وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطَوَالِ الْمُفْصَلِ»

“অমুকের চেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সালাতের সাথে অধিক সাদৃশ্য আর কারো পিছনে আমি সালাত আদায় করিনি। সুলাইমান বলেন, তিনি যুহরের প্রথম দুই রাকা‘আত দীর্ঘ করতেন এবং পরের দুই রাকা‘আত সংক্ষিপ্ত করতেন, আসরকে হালকা করতেন এবং মাগরিবে ছোট সূরাসমূহ (কিসারে মুফাসসাল) পড়তেন। আর এশার সালাতে মধ্যম সূরাসমূহ (ওয়াসাতে মুফাসসাল) পড়তেন এবং ফজরের সালাতে লম্বা সূরাসমূহ (তিওয়ালে মুফাসসাল) পড়তেন।”^১

তিওয়ালে মুফাসসাল (দীর্ঘ সূরাসমূহ) হলো সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরাজ পর্যন্ত; আওসাতে মুফাসসাল (মধ্যম সূরাসমূহ) হলো সূরা বুরাজ থেকে সূরা বাইয়্যিনাহ পর্যন্ত; আর কিসারে মুফাসসাল (ছোট সূরাসমূহ) হলো সূরা বাইয়্যিনাহ থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত।^২

১ সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং (৯৮২); হাফিয ইবনে হাজার বুলূগুল মারাম গ্রন্থে (২৮৬) বলেন: এর সনদ সহীহ।

২ দেখুন: মিরকাতুল মাফাতীহ: (২/৭০০)।

দশম অনুচ্ছেদ: ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলী

মসজিদের ইমামকে মসজিদের স্তম্ভ ও শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। তার মাধ্যমেই মসজিদ দাওয়াত প্রচার, সমাজকে সচেতন করা এবং মানুষকে তাদের দ্বীনের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে। সুতরাং ইমাম যদি আলেম, বুদ্ধিমান, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মানুষের প্রথা ও অবস্থা সম্পর্কে অবগত হোন, তবে মসজিদের জামাআতের উপর এবং মসজিদ সংলগ্ন এলাকার অধিবাসীদের উপর তার প্রভাব উত্তম ও উপকারী হয়। তিনি তাদেরকে শিক্ষা দেন, পথ নির্দেশনা দেন এবং সকল কল্যাণ ও সদগুণের দিকে পরিচালিত করেন।

আর ইমামতের শর্তাবলী পূরণকারী ইমামগণ এমনই ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ছিলেন ইমাম, অতঃপর তার খুলাফায়ে রাশেদীন, তারপর আমীরগণ, সেনাপতিগণ, উলামায়ে কেরাম ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই পদের দায়িত্বশীলকে অবশ্যই দ্বীন, চরিত্র, জ্ঞান ও আচার-আচরণে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে হবে।

আর এখানেই মানুষের জীবনে এই দায়িত্বের গুরুত্ব প্রকাশ পায়। কেননা ইমামদের শক্তি তাদের সমাজে প্রতিফলিত হয় এবং তাদের দুর্বলতার প্রভাবও সেই সমাজগুলোতে প্রকাশ পায়। কারণ, মসজিদই সমাজকে কথার সাথে কাজের সমন্বয় করতে শেখায়।

সুতরাং ইমাম যদি জ্ঞানে বা প্রজ্ঞায় দুর্বল হোন অথবা মন্দ চরিত্র ও আচরণের অধিকারী হোন, তাহলে তিনি ক্ষতি করেন, কোনো উপকার করেন না। আর ইমামের দায়িত্ব যেহেতু মুসল্লিদেরকে কল্যাণ ও সৎকর্মের দিকে পথ দেখানো, তাই একজন অজ্ঞ ইমামের পক্ষে এই মহান দায়িত্ব সম্পাদন করা অত্যন্ত কঠিন।

আবার এমনও হতে পারে যে, ইমাম জ্ঞান ও ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক থেকে এই দায়িত্বের শর্তসমূহ পূরণকারী, কিন্তু তিনি তার এ দায়িত্বের বাইরে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকেন যা তার দায়িত্ব পালনের মানের ওপর প্রভাব ফেলে। ফলে তিনি সালাতের নির্ধারিত সময়ের পরে আসেন এবং সালাতে যে সূরা বা আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন তা তেলাওয়াত করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পান না; একারণে আমরা তাকে দেখি যে, তিনি নির্দিষ্ট কিছু সূরা বা আয়াত দ্বারাই সালাত আদায় করেন, সেগুলো ছাড়া অন্যগুলো পড়েন না।

আর কখনো প্রবৃত্তি, অজ্ঞতা, বিবাদ-বিসংবাদ অথবা নিন্দনীয় চরমপন্থা তার উপর প্রবল হয়, ফলে সে বস্তুনিষ্ঠতা, শিক্ষামূলক নির্দেশনা এবং হিকমত ও উত্তম উপদেশের সাথে দাওয়াত থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।

আর এই দ্বীনে মসজিদের এক মহান প্রভাব রয়েছে; কেননা তা হলো হেদায়াতের মিনার, যেখানে বান্দা তার রবের সাথে সংযোগ স্থাপন করে, তার ঈমান শক্তিশালী হয় এবং সে তার ভাইদের সাথে একত্রিত হয়, যাতে সকলে মিলে সদগুণের প্রসার ও অসৎকর্মের দমনে

পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারে। আর মসজিদ এ দায়িত্ব পালনে ততক্ষণ পর্যন্ত সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তার জন্য এমন একজন ইমামকে প্রস্তুত করেন, যার মধ্যে এই মহান পদ অলংকৃত করার এবং এই মহৎ দায়িত্বের কার্যাবলী সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানগত ও চারিত্রিক যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে।

ইমামের ক্ষেত্রে অপরিহার্য জ্ঞানগত যোগ্যতাসমূহ:

১- আল্লাহর জন্য ইখলাসের সাথে আমল করা; যাতে তা আল্লাহ ও মানুষের কাছে সমর্থিত, সাহায্যপ্রাপ্ত, গ্রহণযোগ্য ও প্রিয় হয়।

২- লৌকিকতা ও অহংকার থেকে দূরে থাকা; কেননা বিষয়সমূহ তার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল এবং আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি কেবল তাই পায়, যা সে নিয়ত করে। আর যে ব্যক্তি এমন কিছু প্রকাশ করে যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাকে লাঞ্চিত করেন।

৩ - আল্লাহর কিতাবের হাফিয হওয়া, অথবা এর থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অংশ হিফয করা, এবং যা হিফয করেছে তার নিয়মিত মুরাজা'আ করা, আর প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াতের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারিত রাখা।

৪- রিয়াদুস সালাহীন, অথবা আল-আরবাঈন আন-নববী, অথবা বুলুগুল মারাম, অথবা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীসের গ্রন্থ থেকে কিছু সংখ্যক হাদীসে নববী মুখস্থ করা।

৫ - সঠিক আকীদা তথা সালাফে সালাহীনের আকীদা শিক্ষা করা।

৬ - দ্বীনের বিধান বিষয়ক ফিকহ শিক্ষা করা, বিশেষ করে ইবাদাতের ফিকহ, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাহরাত, সালাত, যাকাত ও সিয়াম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। অনুরূপভাবে মুআমালাত বা লেনদেন বিষয়ক ফিকহও শিক্ষা করা; যাতে সে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা সম্পর্কে জানতে পারে এবং মানুষকে প্রতারণা, ধোঁকাবাজি ও বাতিল পন্থায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ থেকে সতর্ক করতে পারে, অনুরূপভাবে তাদেরকে ইসরাফ, অপব্যয়, কৃপণতা ও ব্যয়কুণ্ঠতা থেকে সতর্ক করতে পারে; যাতে তাদের আর্থিক কার্যকলাপসমূহ কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত হয়।

৭- আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়া, যাতে আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর উপর যা নাযিল করেছেন তার অর্থ জানতে পারে। কেননা আল-কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে।

৮- সীরাতে নববী, শামায়েলে মুহাম্মাদী এবং সালাফে সালাহীনের জীবন-চরিত অধ্যয়ন করা; কারণ এগুলোর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, সুন্দরতম

অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত, উপকারী জ্ঞানভান্ডার এবং উচ্চতর ইসলামী সংস্কৃতি।

৯- বিশুদ্ধ আকীদা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার কারণে পরিচিত নিজ দেশের আলেমগণ এবং অন্যান্য আলেমদের সম্পর্কে জানা এবং দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েল ও সমাজের সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে তাদের শরণাপন্ন হওয়া।

১০। ইসলামী দলসমূহ ও তাদের আকীদা, বিভিন্ন চিন্তাধারা ও তার উদ্দেশ্য এবং ধ্বংসাত্মক মতবাদ ও তার লক্ষ্যসমূহ সম্পর্কে জানা, যাতে আল্লাহ তা'আলার কিতাব, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুনাহ এবং মুহাক্কিক মুসলিম আলেমগণের লেখনীর আলোকে সেগুলোর পর্যালোচনা করতে, সেগুলোর ভ্রান্তি তুলে ধরতে এবং বাতিল থেকে সতর্ক করতে পারে।

১১- বিভিন্ন গণমাধ্যম, এর সুফল ও কুফল এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে তা থেকে উপকৃত হওয়ার উপায় সম্পর্কে জানা এবং ব্যক্তি ও সমাজের জন্য এর ক্ষতি থেকে সতর্ক করা।

আর যখন মসজিদের ইমামের মধ্যে এই যোগ্যতাসমূহ পাওয়া যায়, তখন তা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় অটলতা ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে।

প্রধান চারিত্রিক উপাদানসমূহ:

১- মসজিদের ইমামের উচিত তার মসজিদের জামা'আত এবং মসজিদে আগত এলাকাবাসী ও

অন্যান্য মুসল্লিদের জন্য একজন দায়ী ও শিক্ষক হওয়া। সুতরাং তার মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ থাকা আবশ্যিক; কেননা তিনি হলেন উম্মাহ ও নেতৃবৃন্দের জন্য উত্তম আদর্শ, সর্বোত্তম নমুনা এবং সর্বোচ্চ উদাহরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (21)

“অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ, তার জন্য যে আশা রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে।” [আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

আর নিজে এবং মসজিদের মুসল্লিদেরকে দুনিয়াবি ও রাজনৈতিক আলোচনা থেকে দূরে রাখা এবং মসজিদকে শুধু ইলম ও ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট রাখা।

২- নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল হওয়া এবং একইভাবে মসজিদের পরিচ্ছন্নতা, এর জিনিসপত্র সাজিয়ে-গুছিয়ে ও সুবিন্যস্ত রাখা এবং এর আনুষঙ্গিক সুবিধাদির রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি যত্নবান হওয়া। এছাড়া অপচয় থেকে দূরে থাকা এবং মসজিদকে কারুকার্য খচিত করা পরিহার করা।

৩- উত্তম আদর্শ ও চালচলনের অধিকারী হওয়া ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ করা, যেমন দাড়ি লম্বা রাখা ও গোঁফ খাটো করা, সাথে টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা পরিহার

করা, গাভীৰ্যতা ও স্থিরতা বজায় রাখা এবং সালাফে সালিহীন (রাহিমাল্হুমুল্লাহ)-এর পথ অনুসরণ করা।

৪- কোমল, সহনশীল ও দয়ালু হওয়া; কারণ কোমলতা কোনো বিষয়ে বিদ্যমান থাকলে তাকে সৌন্দৰ্যমণ্ডিত করে, আর কোনো বিষয় থেকে তা বিদূরিত হলে তাকে কলুষিত করে, যেমনটি হাদীসে এসেছে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانُهُ»

“নিশ্চয় কোমলতা যেকোনো কিছুকে সৌন্দৰ্যমণ্ডিত করে। আর কোনো কিছু থেকে কোমলতা বিদূরিত হলে তা তাকে কলুষিত করে।”^১

সুতরাং মসজিদের কোনো মুসল্লী থেকে কোনো ভুল প্রকাশ পেলে, ইমামের উচিত নয় তাকে তিরস্কার করা; বরং তাকে নম্রতার সাথে নসীহত করা এবং উত্তম পন্থায় শিক্ষা দেওয়া। এ ব্যাপারে মু'আবিয়া বিন হাকাম আস-সুলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন:

بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَرَامَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَانْكَلَّ أَمْيَاهُ، مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَازِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَبِأَيْ هُوَ وَأَمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي -أَي: مَا فَهَرَنِي وَلَا نَهَرَنِي- وَلَا

১ সহীহ মুসলিম: (২৫৯৪)।

ضَرَبَنِي وَلَا تَشْتَمْنِي، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»

একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম; এমন সময় লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি বললাম, ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’। তখন লোকেরা আমার দিকে তাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। আমি বললাম, ‘হায়! আমার মা আমাকে হারিয়ে ফেলুক! তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে আছ?’ তখন তারা নিজ নিজ উরুতে হাত চাপড়াতে লাগল। আমি যখন দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে, তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষ করলেন—আমার পিতা-মাতা তার জন্য কুরবান হোক—আমি তার আগে বা পরে তার চেয়ে উত্তম কোনো শিক্ষক দেখিনি। আল্লাহর শপথ! তিনি আমাকে তিরস্কার করেননি, বা আমাকে ধমক দেননি, প্রহার করেননি এবং গালিও দেননি। তিনি বললেন, “এই সালাতের মাঝে সাধারণ কোনো কথা-বার্তা বলা বৈধ নয়। এটা তো কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ করার ক্ষেত্র।”^১

৫- নম্র ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া; যাতে মানুষ তার চারপাশে সমবেত হয়ে তার মমতা, সহযোগিতা ও জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হতে পারে। তাদের

^১ সহীহ মুসলিম: (৫৩৭)।

বিপদ-আপদ ও প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং মসজিদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করা।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সবকিছুর সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন, যেমন আল্লাহ তা‘আলা তার সম্পর্কে বলেছেন:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (159)

“আল্লাহ্‌র দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন; যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর আপনি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ (তার উপর) নির্ভরকারীদের ভালবাসেন।” [আলে ইমরান: ১৫৯]

০৬- সবার ও য্যাকীনের গুণে গুণান্বিত হওয়া এবং কথায় সত্যবাদী হওয়া, যাতে তিনি নিজ মসজিদ ও জামা‘আতের মধ্যে ইমামতের মর্যাদা লাভের যোগ্য হোন; কেননা সবার ও য্যাকীন বান্দাকে দ্বীনি ইমামতের মর্যাদায় পৌঁছে দেয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِأَيْمِنِنَا يُوقِنُونَ﴾ (24)

“আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে হেদায়াত করত; যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহ য্যাকীন - দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।” [সূরা আস-সাজদাহ: ২৪]

০৭-তাকে অবশ্যই তার কথায় সত্যবাদী হতে হবে, চায় তা জুমার খুতবায় হোক, কিংবা শিক্ষা ও উপদেশের দারসে হোক, অথবা মানুষের সাথে তার কথাবার্তায় হোক, যেন সে সত্যবাদী, সঠিক পথপ্রাপ্ত ও সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কেননা হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এসেছে যে, তিনি বলেছেন:

«عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا»

“তোমরা অবশ্যই সত্য অবলম্বন করবে; কেননা সত্য সৎকর্মের দিকে পরিচালিত করে, আর সৎকর্ম জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলতে থাকলে ও সত্য বলার চেষ্টায় রত থাকলে, অবশেষে আল্লাহর নিকটে সে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকবে; কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পরিচালিত করে, আর পাপ জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলতে থাকলে এবং মিথ্যার

উপর অবিচল থাকার চেষ্টা করলে, অবশেষে সে আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়»¹

আর মিথ্যা হলো অনিষ্টতা ও বিপদ। আর সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো আল্লাহ তা‘আলার ওপর মিথ্যাচার করা এবং জ্ঞান ছাড়া তাঁর সম্পর্কে কথা বলা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْأَبْغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (33)

বলুন, নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা। আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন করা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরীক করা- যে ব্যাপারে কোনো প্রমাণ তিনি নাযিল করেননি। আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।’ [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৩৩]

এই মহান আয়াতটি নিম্ন থেকে উচ্চ ক্রমানুসারে সবচেয়ে বড় গুনাহগুলোকে একত্রিত করেছে। আর তা হলো, আল্লাহর নাম, তাঁর গুণাবলী ও তাঁর শরী‘আত সম্পর্কে ইলম ব্যতীত কথা বলা।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যারোপ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা ও জঘন্যতম গুনাহ। এটি এমন এক কবীরাহ গুনাহ যার কর্তাকে জাহান্নামের হুমকি দেওয়া হয়েছে; এ মর্মে মুগীরাহ

¹ সহীহ বুখারী (৬০৯৪), মুসলিম (২৬০৭), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

ইবন শু'বাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَذِبًا عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

“নিশ্চয় আমার ওপর মিথ্যা বলা অন্য কারো ওপর মিথ্যা বলার মতো নয়। যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ করলো, সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়।”^১

আর মিথ্যা পরিহার করবে, যদিও তা ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ এবং মন্দ কাজ থেকে ভীতি প্রদর্শনের সং উদ্দেশ্যেও হয়, যেমনটি কিছু কিছু বক্তা করে থাকেন। কারণ এটি একটি মন্দ কাজ, যার মাঝে কোনো কল্যাণ বা হিদায়াত নেই। আর এর বক্তা সওয়াবের পরিবর্তে পাপী হয় এবং লাভবান হওয়ার পরিবর্তে গুনাহগার হয়।

৮- বক্তব্য প্রদানে আমানতদার হবে, সংবাদের বিশুদ্ধতা যাচাই করবে, গুজব গ্রহণে তাড়াহুড়া করবে না এবং কেবল নির্ভরযোগ্য কথার উপর নির্ভর করবে। আর এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَتُدْمِينَ ﴿٦﴾»

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (১২৯১), সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৪)।

“হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ, এ আশঙ্কায় যে, অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।” [আল-হুজুরাত: ৬]

৯- মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার ব্যাপারে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে এবং তাদের গোপন বিষয়সমূহ গোপন রাখবে। কেননা, যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি দুনিয়া ও আখেরাতে গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি মুসলিমদের দোষ-ত্রুটির সন্ধানে থাকে, আল্লাহও তার দোষ-ত্রুটির সন্ধানে থাকেন এবং পরিশেষে তাকে অপমানিত করেন যদিও সে তার নিজ ঘরের ভেতরে অবস্থান করে। আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ سَنَّ رَسُولًا سَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন।”- আবু বারযাহ আল-আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:^১

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (২৪৪২), সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (২৫৮০)।

«يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بَلِيسَانِيهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قُلُوبَهُ، لَا تَعْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ»

“হে ঐ সব লোক যারা শুধুমাত্র মুখে ঈমান এনেছ, কিন্তু ঈমান এখনো অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের দোষত্রুটি তলাশ করিও না। কারণ যারা তাদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়াবে আল্লাহও তাদের দোষত্রুটি খুঁজবেন। আর আল্লাহ কারো দোষত্রুটি তলাশ করলে, তাকে তার বাড়ির মধ্যেই অপদস্থ করবেন।”^১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: জুমু‘আর সালাত ও

খুতবা

প্রথম অনুচ্ছেদ : জুমু‘আর সালাত

প্রথম মাসআলা: জুমু‘আর সালাতের পরিচয়

ও সময়:

প্রথমত: জুমু‘আর সালাতের সংজ্ঞা:

জুমু‘আ হল: সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিন, যে দিনে জুমু‘আর সালাত নামক একটি বিশেষ সালাত আদায় করা হয়।^২

১ সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং (৪৮৮০)। এসব গুণাবলী সম্পর্কে আরও দেখুন: শাইখ সাউদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-বশার রচিত ‘ইমামুল মাসজিদ: মুকাওয়ামাতিহিল ইলমিয়াহ ওয়াল খুলুকিয়াহ’।

২ দেখুন: মুহাম্মাদ রাওয়াস কাল‘আজি ও অন্যান্য রচিত, মু‘জামুলুগাতিল ফুকাহা: (পৃ. ১৬৬)।

এ উম্মতকে জুমু‘আর দিনের হিদায়াত প্রদান আল্লাহর এক মহান অনুগ্রহ। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيِّنَةٌ - أَيْ: غَيْرَ - أَنَّهُمْ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأَوْتَيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَذَا اللَّهُ لَهُ، فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَالْيَهُودُ غَدًا، وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ»

“আমরা শেষে আগমনকারী এবং কিয়ামতের দিন অগ্রগামী। তবে তাদেরকে আমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছে এবং আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদের পরে। আর এই দিনটি তাদের উপর ফরয করা হয়েছিল, কিন্তু তারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছে। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে এ দিনের ব্যাপারে হিদায়াত দিয়েছেন। সুতরাং এ দিনে তারা আমাদের অনুসারী। সুতরাং ইয়াহুদীরা হল আমাদের পরের দিন, আর নাসারারা তারও পরের দিন।”^১

আর জুমু‘আর দিন হলো সূর্য উদিত হওয়া দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا»

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৮৭৬), মুসলিম, হাদীস নং (৮৫৫)।

“যে দিনগুলোতে সূর্য উদিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে জুমু‘আর দিন। এদিনে আদামকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এ দিনে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছিল, এ দিনেই তাকে সেখান থেকে বের করা হয়েছিল।”^১

আর এক জুমু‘আ থেকে আরেক জুমু‘আ আদায় করা উভয়ের মধ্যবর্তী গুনাহের জন্য কাফফারা স্বরূপ; কেননা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন:

«الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنِبْتَ الْكَبَائِرَ»

“পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমু‘আ থেকে আরেক জুমু‘আ এবং এক রামাযান থেকে আরেক রামাযান এর মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা হয়ে যায়, যদি কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা হয়।”^২

জুমুআর সালাত: এটি একটি স্বয়ংসম্পন্ন সালাত যা রাকাত সংখ্যা, উচ্চস্বরে কিরাত পড়া, খুতবা প্রদান ও তার জন্য প্রযোজ্য শর্তসমূহের ক্ষেত্রে যোহরের সালাত থেকে ভিন্ন; তবে ওয়াক্তের ক্ষেত্রে মিল আছে।

দ্বিতীয়ত: জুমার সালাতের ওয়াক্ত:

জুমু‘আর ওয়াক্ত হলো যোহরের ওয়াক্ত, সূর্য্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে কোনো বস্তুর ছায়া তার মূল ছায়া

১ সহীহ মুসলিম: (৮৫৪)।

২ সহীহ মুসলিম: (২৩৩)।

ব্যতীত তার সমান হওয়া পর্যন্ত। এর দলীল হলো আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু 'আনহু-এর হাদীস যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু'আর সালাত আদায় করতেন যখন সূর্য ঢলে যেত। অর্থাৎ: তা পশ্চিম দিকে হেলে যেত এবং আসমানের মধ্যভাগ থেকে সরে যেত, আর এটিই যোহরের সালাতের ওয়াস্ত।^১

দ্বিতীয় মাসআলা: জুমু'আর সালাতের হুকুম কী এবং কার উপর তা ওয়াজিব?

প্রথমত: জুমার সালাতের হুকুম:

জুমু'আর সালাত পুরুষদের উপর ফরযে আইন;
কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (9)

“হে ঈমানদারগণ! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্বরণে ধাবিত হও এবং কেনা-বেচা ত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।” [আল-জুমুআ: ৯]
আবদুল্লাহ ইবনু উমার ও আবু হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তার মিস্বারের সিড়িতে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন:

﴿لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ -أَي: تَرْكِهِمْ- الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾

^১ হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন: (৯০৪)।

“লোকেরা যেন জুমা ত্যাগ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে; নচেৎ আল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিবেন, অতঃপর তারা অবশ্যই গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।”^১

মুসলিমগণ জুমু‘আহর সালাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, ইবনুল মুনযির রহিমাহুল্লাহ তা‘আলা বলেছেন: আর তারা এ ব্যাপারে সর্বসম্মতভাবে একমত যে, স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, মুকীম ও ওযরবিহীন পুরুষদের ওপর জুমু‘আ ওয়াজিব।^২

দ্বিতীয়ত: কার উপর জুমু‘আ ওয়াজিব?

জুমু‘আহ ওয়াজিব প্রত্যেক স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানসম্পন্ন, সক্ষম ও মুকীম মুসলিম পুরুষের উপর। সুতরাং তা ক্রীতদাস, নারী, নাবালেগ, উন্মাদ, অসুস্থ অথবা মুসাফিরের উপর ওয়াজিব নয়। এর দলীল হলো, তারিক ইবন শিহাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন:

«الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»

“জুমু‘আহ জামা‘আতে আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যকীয় ওয়াজিব, তবে চারজন ব্যতীত: ক্রীতদাস, নারী, শিশু অথবা অসুস্থ ব্যক্তি।”^৩

১ সহীহ মুসলিম: (৮৬৫)।

২ আল-ইজমা: (পৃ. ৪০)

৩ আবু দাউদ, হাদীস নং (১০৬৭)।

আর মুসাফিরের উপর জুমু'আহ ওয়াজিব নয়; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সফরগুলোতে তা আদায় করতেন না। আর তার হজ্জের সময় আরাফার দিনটি জুমু'আর দিন হওয়া সত্ত্বেও তিনি যোহর আদায় করেছেন এবং তার সাথে আসরকে জমা করেছেন।

ইবনুল মুনযির রাহিমাহুল্লাহ এ বিষয়ে ঐক্যমত্য বর্ণনা করে বলেন: আর তারা এ ব্যাপারে ইজমা করেছেন যে, শিশু ও নারীদের ওপর জুমু'আ নেই... এবং তারা এ ব্যাপারেও ইজমা করেছেন যে, জুমু'আ স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, মুকীম ও ওযরবিহীনদের ওপর ওয়াজিব"।^১

আর যদি ক্রীতদাস, মহিলা, নাবালেগ, অসুস্থ ব্যক্তি অথবা মুসাফির জুমায় উপস্থিত হয়, তাহলে তাদের সালাত সহীহ হবে এবং তা যোহরের সালাতের পক্ষ থেকে যথেষ্ট হবে।

পশুপালন ও পানির সন্ধানে বিচরণকারী যাযাবরদের উপর জুমু'আর সালাত ওয়াজিব নয়; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যাযাবরগণ মদীনার আশেপাশে বসবাস করতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জুমু'আহর আদেশ দেন নি। আর ইমাম আহমাদ বলেছেন: যাযাবরদের উপর জুমু'আ নেই; কারণ তারা স্থানান্তর হতে থাকে। তিনি এই স্থানান্তরকেই তা রহিত হওয়ার

^১ আল-ইজমা: (পৃ. ৪০)

কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি স্থায়ী বাসিন্দা, যে স্বেচ্ছায় স্থানান্তর হয় না, সে জনপদের অধিবাসী"।^১

সর্বনিম্ন তিনজনের মাধ্যমে জুমা অনুষ্ঠিত হতে পারে: একজন খুত্ববা প্রদান করবে এবং দুইজন শ্রবণ করবে; কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{...فَأَسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ...}

...“সুতরাং তোমারা আল্লাহর স্বরণে ধাবিত হও”...। [সূরা আল-জুমুআহ, আয়াত: ০৯] এখানে ব্যবহৃত শব্দটি বহুবচন, আর বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা হচ্ছে তিনজন।

তৃতীয় মাসআলা: জুমু'আর সালাতের পদ্ধতি:

জুমু'আর সালাত দুই রাকাত, যাতে কিরাআত জোরে পড়া হয়; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটিই করতেন এবং এ ব্যাপারে আলেমগণ ইজমা করেছেন। ইবন হাযম রাহিমাহুল্লাহ বলেন: “সকলে এ ব্যাপারে একমত যে, জুমু'আর সালাত -এর শর্তাবলী পূর্ণ হলে- দুই রাকাত এবং এ দু'রাকাতে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়া হয়”।^২

আর প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা আল-আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা আল-গাশিয়াহ

^১ মাজমুউল ফতোয়া: (২৪/১৬৬)।

^২ মারাতিবুল ইজমা: (পৃ. ৩৩)।

পাঠ করা সুন্নাত। এ মর্মে নু‘মান ইবন বাশীর রাদিয়াল্লাহু
‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى،
وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ» [110].

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ঈদে ও
জুমু‘আয় ‘সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ‘লা’ এবং ‘হাল
আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ’ পড়তেন।”¹

অথবা প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা আল-
জুমু‘আহ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহা ও সূরা
আল-মুনাফিকুন পড়বে। ইবন আবী রাফি‘ থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন, মারওয়ান আবু হুরায়রাকে মদীনার দায়িত্ব
দিয়ে মক্কায় গমন করেন। অতঃপর আবু হুরায়রা
আমাদেরকে নিয়ে জুমু‘আর সালাত আদায় করেন।
তিনি সূরা আল-জুমু‘আর পর শেষ রাকাতে সূরা আল-
মুনাফিকুন পড়েন। বর্ণনাকারী বলেন: আমি আবু
হুরায়রার সালাত শেষ হওয়ার পর তার নিকট পৌঁছলাম
এবং তাকে বললাম, আপনি এমন দুটি সূরা দ্বারা সালাত
আদায় করেছেন যা দ্বারা আলী ইবন আবী তালিব
কুফায় সালাত পড়তেন। তখন আবু হুরায়রা বললেন:

«إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» [111].

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে
জুমু‘আর দিন এ দুটি সূরা পড়তে শুনেছি।”²

¹ সহীহ মুসলিম: (৮৭৮)।

² সহীহ মুসলিম: (৮৭৭)।

চতুর্থ মাসআলা: জুমুআ কিসের মাধ্যমে (কতটুকুর মাধ্যমে) পাওয়া যায়?

ইমামের সাথে এক রাকাত পাওয়ার মাধ্যমে জুমুআ পাওয়া যায়; আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرَهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»

“যে ব্যক্তি জুমু‘আর অথবা অন্য কোনো সালাতের এক রাকাত পেল, তার সালাত পূর্ণ হলো।”^১

আর এক রাকাতের কম পেলে যোহরের সালাত আদায় করবে।^২

অতএব, যার জুমার সালাতের এক রাকাত ছুটে যায় এবং সে ইমামকে দ্বিতীয় রাকাতে রুকু অবস্থায় বা তার পূর্বে পায়, সে কেবল এক রাকাত আদায় করবে, নিম্ন হাদীস অনুসারে:

«وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»

“আর যে ব্যক্তি এক রাকাত পেল, সে ঐ সালাতই পেল।”^৩

পঞ্চমত: জুমু‘আর দিনে যা করা হারাম বা মাকরুহ:

১- ইমামের খুতবা চলা অবস্থায় কথা বলা হারাম, কেননা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

১ নাসাঈ, হাদীস নং (৫৫৭)।

২ দেখুন: আল-মুগনী, ইবনু কুদামাহ (২/২৩১)।

৩ আবু দাউদ, হাদীস নং (৮৯৩)।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَعُوتَ»

“জুম‘আর দিন ইমামের খুতবা প্রদানকালে যখন তুমি তোমার সাথীকে বললে, ‘চুপ করো’ তখন তুমি একটি অনর্থক কাজ করলে।” অর্থাৎ তুমি অনর্থক কথা বললে, আর তা হল বাতিল ও প্রত্যাখ্যাত কথা এবং এতে তোমার জুমু‘আর ফযীলত নষ্ট হয়ে গেল।^১

ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন: এই হাদীসে খুতবার সময় সব ধরনের কথা বলা থেকে নিষেধ করা হয়েছে এবং এর দ্বারা অন্যান্য কথার ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছে। কারণ, ‘চুপ করো’ বলাকে পর্যন্ত অনর্থক কাজ বলা হয়েছে, অথচ তা মূলত সৎকাজেরই আদেশ; সুতরাং সাধারণ কথা তো আরও বেশি করে অনর্থক কাজ হিসেবে গণ্য।^২

কথা বলার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে হাঁছির জবাব দেওয়া এবং সালামের উত্তর দেওয়াও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা ইমামের খুতবা চলা অবস্থায় জায়েয নয়। তবে খতিব খুতবা শুরু করার পূর্বে এবং দুই খুতবার মাঝের বিরতির সময় কথা বলায় কোনো দোষ নেই।

আর খতীবের সঙ্গে মুক্তাদীর কথা বলাতে কোনো দোষ নেই, কেননা আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

^১ সহীহ বুখারী (৯৩৪), মুসলিম (৮৫১)।

^২ শারহ মুসলিম: (৬/১৩৮)।

«أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ دَارِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتَ الْأَمْوَالُ وَالنَّفْسُ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يُغَيِّرَنَا فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ...» الْحَدِيثُ [117].

“এক ব্যক্তি জুমু‘আর দিন দারুল কাযার দিকের দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করল, আর সেসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিচ্ছিলেন। অতঃপর সে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখোমুখি হলো, তারপর বলল, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি আল্লাহর কাছে দো‘আ করুন তিনি যেন আমাদের বৃষ্টি দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দু‘হাত তুললেন”... উক্ত হাদীসের শেষ পর্যন্ত।^১

২- খুতবা চলাকালীন খেলা করা হারাম, যেমন: পাথর স্পর্শ করা, তাসবীহ ব্যবহার করা, অথবা মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকা এবং এ জাতীয় কাজ; কেননা, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে প্রমাণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَعَا»

“যে ব্যক্তি কংকর স্পর্শ করল সে অনর্থক কাজ করল।” আর তা এ কারণে যে, অনর্থক কাজ অনুধাবন ও একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়।^২

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৯৬৭), সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৮৯৭)।

২ সহীহ মুসলিম: (৮৫৭)।

৩- খুতবা চলা অবস্থায় মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যাওয়া হারাম; কেননা আব্দুল্লাহ ইবন বুসর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: জুমার দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা প্রদানকালে এক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে আসল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন:

«اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ»

“তুমি বসো, তুমি কষ্ট দিয়েছো।”^১

এর কারণ হলো, ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার মধ্যে মুসল্লিদের কষ্ট দেওয়া হয় এবং খুতবা শোনার ক্ষেত্রে তাদের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটে। তবে ইমামের জন্য ঘাড় ডিঙ্গিয়ে যাওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই, যদি তিনি তা ছাড়া তার স্থানে পৌঁছাতে না পারেন। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কোনো অপরিহার্য প্রয়োজনে, যেমন উষু করা, বা সামনের কোনো ফাঁকা স্থান পূরণ করার জন্য ডিঙ্গিয়ে যেতে বাধ্য হয়, তার ক্ষেত্রেও একই বিধান।

৪- কাউকে তার বসার স্থান থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসা হারাম; কেননা জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে প্রমাণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ لِيُخَالِفَ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلَكِنْ افْسَحُوا»

^১ সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং (১১১৮)।

“তোমাদের কেউ যেন জুমু‘আর দিনে তার ভাইকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় গিয়ে না বসে, বরং তোমরা জায়গা প্রশস্ত করো।”^১

৫- দু ব্যক্তির মাঝে বসে অথবা তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে গিয়ে তাদেরকে পৃথক করা মাকরুহ; কেননা সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে প্রমাণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ... ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يَفْرِقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى»

“যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন গোসল করে... অতঃপর (মসজিদে) যায় এবং দু’জন লোকের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে না, অতঃপর তার জন্য নির্ধারিত সলাত আদায় করে, অতঃপর ইমাম বের হলে চুপ থাকে, তার সেই জুমু‘আ ও পরবর্তী জুমু‘আর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়।”, এতে প্রমাণিত হয় যে, যে দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়, সে এই ক্ষমা লাভ করে না।^২

ষষ্ঠ মাসআলা: জুমু‘আর সুন্নাতসমূহ:

১- জুমু‘আর দিন ফজরের সালাতে সূরা সাজদাহ ও সূরা ইনসান পড়া সুন্নাত; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়মিত তা পাঠ করতেন। এ মর্মে

^১ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (২১৭৮)।

^২ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৯১০)।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ الْم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ» [122].

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু‘আর দিন ফজরের সালাতে السَّجْدَةِ الْم تَنْزِيلُ (তথা সূরা সাজদা) এবং وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ (সূরা ইনসান) পড়তেন।”¹

২- জুমার দিন গোসল করা, এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত; কারণ আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةُ فَلْيَغْتَسِلْ»

“তোমাদের কেউ যখন জুমু‘আয় উপস্থিত হয়, সে যেন গোসল করে।”. এর প্রতি যত্নবান হওয়া এবং তা ত্যাগ না করা উচিত, বিশেষ করে যাদের শরীরে দুর্গন্ধের সমস্যা রয়েছে।²

জুমু‘আর গোসলের সময় ফজর উদিত হওয়া থেকে শুরু হয়। নাপাকীর জন্য গোসল করা জুমু‘আর গোসল হিসেবে যথেষ্ট হবে; কারণ জুমু‘আর গোসলের উদ্দেশ্য হলো শরীর থেকে দুর্গন্ধ দূর করে পরিচ্ছন্ন হওয়া, আর তা নাপাকীর গোসলের মাধ্যমেও অর্জিত হয়। তবে

1 সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৮৯১), সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৮৮০)।

2 সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৮৭৭), মুসলিম, হাদীস নং (৮৪৪)।

নাপাকীর গোসলের সাথে জুমু‘আর গোসলেরও নিয়ত করা শরিয়তসম্মত; যাতে এর দ্বারা উভয় সাওয়াব লাভ করা যায়।

৩- সুগন্ধি ব্যবহার করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা এবং শরীর থেকে যা দূর করা উচিত তা দূর করা সুন্নাত; যেমন নখ কাটা, নাভির নিচের লোম ও বগলের চুল পরিষ্কার করা এবং গোঁফ ছোট করা। এর প্রমাণ সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাদীস, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ، ثُمَّ اَدَّاهَنْ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غَفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى»

“যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন গোসল করে এবং যথাসাধ্য ভালরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, অতঃপর তেল ব্যবহার করে বা সুগন্ধি লাগায়, তারপর (মসজিদের দিকে) রওয়ানা হয় এবং দু’জন লোকের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে না, অতঃপর তার সুযোগমত সালাত আদায় করে, তারপর ইমাম বের হলে চুপ থাকে, তার এ জুমু‘আ ও পরবর্তী জুমু‘আর মধ্যবর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়।”^১

অনুরূপভাবে এ দিনে মিসওয়াক ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করা উচিত; এ মর্মে আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৯১০)।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে
সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি বলেছেন:

«الْعُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ -أَي: يَسْتَاكُ- وَأَنْ
يَمَسَّ طَبِيبًا إِنْ وَجَدَ»

“জুমু‘আর দিন প্রত্যেক বালিগের জন্য গোসল করা
ওয়াজিব (কর্তব্য)। আর মিস্ওয়াক করবে এবং সুগন্ধি
পাওয়া গেলে তা ব্যবহার করবে।”^১

৪- তার জন্য সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরিধান করা
সুন্নাত; উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর
হাদীসের আলোকে:

«أَنَّهُ رَأَى حُلَّةً سَبْرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ
هَذِهِ، فَلَبِسْتُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَلْوُفْدُ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْنَا...»

তিনি মসজিদের দরজার কাছে একটি রেশমী ছল্লা
(পোশাক) দেখতে পেয়ে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল!
যদি আপনি এটি ক্রয় করতেন এবং জুমু‘আর দিনে ও
আপনার নিকট কোনো প্রতিনিধিদল আগমন করলে
তা পরিধান করতেন...।”^২

৫- জুমু‘আর দিন সকাল সকাল মসজিদে গমন করা
সুন্নাত; কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর
প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন; এ মর্মে আবু হুরায়রা
রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে যে,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৮৮০)।

২ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৮৮৬), সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (২০৬৮)।

«مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ -أَي: غُسْلًا صِفَتْهُ كَصِفَةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ- ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَهُ -وَهِيَ وَاحِدَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى- وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ»

“যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন নাপাকীর গোসল করে (অর্থাৎ নাপাকীর গোসলের পদ্ধতির ন্যায় গোসল করে), অতঃপর সকাল সকাল গমন করে, সে যেন একটি উট কুরবানী করল (আর তা হলো পুরুষ বা স্ত্রী জাতীয় উট)। আর যে ব্যক্তি দ্বিতীয় পর্যায়ে গমন করে সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় পর্যায়ে গমন করে সে যেন একটি শিং বিশিষ্ট দুধা কুরবানী করল। আর যে ব্যক্তি চতুর্থ পর্যায়ে গমন করল সে যেন একটি মুরগী কুরবানী করল। আর যে ব্যক্তি পঞ্চম পর্যায়ে গমন করল সে যেন একটি ডিম কুরবানী পেশ করল। অতঃপর ইমাম যখন (খুতবাহ দেয়ার জন্য) বের হন তখন ফিরিশতাগণ যিকির(খুৎবা) শ্রবণের জন্য উপস্থিত হয়ে যান।”^১

৬- জুমু‘আর দিন ইমামের খুতবা চলা অবস্থায় যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, তার জন্য সুন্নাত হলো, সে যেন দুই রাকা‘আত সালাত সংক্ষেপে আদায় না করে না বসে; কারণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবার সময় মসজিদে প্রবেশকারীকে

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৮৮১), সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৮৫০)।

এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ মর্মে জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু‘আর দিন সুলাইক আল-গাতফানী আসলেন, সেসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি বসে পড়লেন। তখন তিনি তাকে বললেন:

«يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكَعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»

“হে সুলাইক, দাঁড়াও এবং সংক্ষেপে দুই রাক‘আত সালাত আদায় কর।” অতঃপর বলেন:

«إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»

“জুমু‘আর দিন ইমামের খুতবা দেওয়ার সময় যখন তোমাদের কেউ আসে, সে যেন দু’রাকাত সালাত আদায় করে এবং তা সংক্ষেপে আদায় করে।”^১

৭- জুমু‘আর দিন সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা সুন্নাত; এ মর্মে আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৯৩০), সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৮৭৫)।

“যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন সূরাহ কাহাফ পাঠ করে, তার জন্য এক জুমু‘আ হতে আরেক জুমু‘আ পর্যন্ত নূর দ্বারা আলোকিত করা হয়।”^১

৮- জুমুআর দিনে ও রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বেশী বেশী দরুদ পাঠ করা সুন্নাত; এ মর্মে আউস ইবন আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»

“তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো জুমু‘আর দিন। সুতরাং এ দিনে আমার উপর বেশি বেশি দরুদ পাঠ করো; কেননা তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হয়।”^২

৯- এ দিনে বেশী বেশী দু‘আ করা এবং কবুলের সময়ের প্রতি খেয়াল রেখে দুআ করা সুন্নাত। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু‘আর দিন সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন:

«فِيهِ سَاعَةٌ، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»

১ হাকিম আল-মুস্তাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, হাদীস নং (৩৩৯২), তবে হাদীসটি আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নিজস্ব বক্তব্য হিসেবে বর্ণিত আছে।

২ আবু দাউদ, হাদীস নং (১৫৩১)।

“এতে এমন একটি সময় রয়েছে, যে সময় কোনো মুসলিম বান্দা সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করলে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দান করেন।”^১

জুমু‘আহর সকল সময়েই দু‘আ কবুল হওয়ার আশা করা যায়, তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক সময় হলো জুমু‘আর দিন ইমামের খুত্ববার জন্য বসা থেকে শুরু করে সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত, এবং জুমু‘আর দিনের শেষ সময়টি ঐ ব্যক্তির জন্য যে মাগরিবের সালাতের অপেক্ষায় বসে থাকে, সে মসজিদে থাকুক বা নিজ ঘরে; কেননা আবু মূসা আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু‘আহর সেই বিশেষ মুহূর্ত সম্পর্কে বলেছেন:

«هِيَ مَا بَيَّنَّ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ»

“তা হলো ইমামের বসা থেকে সালাত সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত।”^২

সপ্তম মাসআলা: জুমুআর নফল:

জুমু‘আর সালাতের আগে কোনো নিয়মিত সুন্নাত নেই, কিন্তু যে ব্যক্তি জুমু‘আয় আসবে, সে যত ইচ্ছা সালাত আদায় করতে পারে; দুই রাকাত, চার, ছয় বা তার চেয়েও বেশি এবং প্রতি দুই রাকাত পর সালাম ফিরাবে;

^১ সহীহ বুখারী (৯৩৫), মুসলিম (৮৫২)

^২ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৮৫৩)।

কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন, যেমনটি সালমান ফারসী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ... ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى»

“যে ব্যক্তি জুমু‘আর দিন গোসল করে... অতঃপর (মসজিদে) যায় এবং দু’জন লোকের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে না, অতঃপর তার সুযোগমত সলাত আদায় করে, অতঃপর ইমাম বের হলে চুপ থাকে, তার সেই জুমু‘আ ও পরবর্তী জুমু‘আর মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।” এবং সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর আমল ও তা সাধারণ নফল সম্পর্কে বর্ণিত ব্যাপক ফযীলতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে।¹

আর জুমু‘আর পরে সুন্নাতে রাতিবা হিসেবে নিজ ঘরে দু‘রাকা‘আত, অথবা মাসজিদে চার রাকাত সলাত আদায় করবে।

«فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ» [134].

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু‘আর পরে তার ঘরে দু‘রাকা‘আত সলাত আদায় করতেন।”² আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

¹ হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন: (৯১০)।

² সহীহ বুখারী (৯৩৭), মুসলিম (৭২৯), ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হাদীস।

«إِذَا صَلَّيْ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا»

“তোমাদের কেউ যখন জুমু‘আর সালাত আদায় করে, সে যেন এর পরে চার রাক‘আত সালাত আদায় করে।”^১

সুতরাং জুমু‘আর নিয়মিত সুন্নাহ মসজিদে আদায় করা হলে চার রাকাত, আর ঘরে আদায় করা হলে দুই রাকাত আদায় করতে হবে।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: জুমু‘আর খুতবা সম্পর্কে

প্রথম মাসয়ালা: জুমুআর খুতবা:

তা হলো জুমুআর সালাতের পূর্বে বহু সংখ্যক মানুষের সামনে প্রদত্ত এমন এক বক্তব্য, যাতে আল্লাহর হামদ, তাঁর গুণকীর্তন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দরুদ ও সালাম এবং ওয়ায ও নসীহত অন্তর্ভুক্ত থাকে।^২

দ্বিতীয় মাসয়ালা: খুতবার হুকুম:

খুতবা জুমু‘আর সালাতের শর্ত; যা ছাড়া তা শুদ্ধ হয় না; কেননা আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ...﴾

“হে ঈমানদারগণ! জুমু‘আর দিনে যখন সালাতের জন্য ডাকা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্বরণে ধাবিত হও”... [সূরা আল-জুমুআ, আয়াত: ০৯] আর ‘আল্লাহর

^১ সহীহ মুসলিম: (৮৮১)।

^২ দেখুন: মু‘জামু লুগাতিল ফুকাহা: (পৃ: ১৯৭), আল-হুজাইলান রচিত, খুতবাতুল জুমু‘আহ ওয়া আহকামুহাল ফিকহিয়্যাহ: (পৃ: ২২)।

যিকির'-এর ব্যাখ্যা খুতবা দ্বারা করা হয়েছে; কেননা খুতবা ওয়াজিব না হলে তার জন্য চেষ্টাও ওয়াজিব হতো না। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা এর ওপর অটল ছিলেন এবং কখনো তা ত্যাগ করেন নি।^১

ইমাম ইবনু কুদামা আল-হাম্বলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: (সারকথা হলো, জুমুআর সালাতের জন্য খুতবা শর্ত, যা ছাড়া তা সহীহ হয় না।)^২

তৃতীয় মাসয়ালা: খুতবার শর্তসমূহ:

১. দুটি খুতবা হওয়া; কেননা আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا» [139].

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই খুতবা দিতেন আর দুই খুতবাহর মাঝে বসতেন”।^৩

২- জুমুআর সালাতের সময় হওয়ার পর হতে হবে, সুতরাং এর পূর্বে তা বা তার কোনো অংশ আদায় হলে তা বিশুদ্ধ হবে না।

৩- সালাতের পূর্বে দুটি খুতবা প্রদান করা: কেননা সাযিব ইবনু ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন:

১ দেখুন: তাফসীরু আত-তাবারী: (২২/ ৬৪২)।

২ আল-মুগনি: (২/২২৪)।

৩ হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন: (৯২৮)।

«إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا» [140]

“জুমু‘আর দিনের প্রথম আযান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর যুগে তখন হতো, যখন ইমাম জুমু‘আর দিন মিস্বরে বসতেন।”^১ আর এটি সালাতের পূর্বে দুইটি খুতবা প্রদানের ব্যাপারে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي»

“তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছ সেভাবে সালাত আদায় করা”, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই খুতবার পরেই সালাত আদায় করতেন। আল-মারদাওয়াী বলেন:^২ (কোন প্রকার মতভেদ ছাড়াই সালাতের পূর্বে উভয়টি (অর্থাৎ দুটি খুতবা) হওয়া শর্ত।)^৩

৪- খুতবার অংশসমূহের মাঝে ধারাবাহিতা বা অবিচ্ছিন্নতা, ইমাম ইবন কুদামাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: খুতবার শুদ্ধতার জন্য ধারাবাহিকতা একটি শর্ত। সুতরাং যদি দীর্ঘ কথা, দীর্ঘ নীরবতা অথবা এমন কিছু দ্বারা খুতবার অংশগুলোর মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঘটানো হয় যা ধারাবাহিকতা নষ্ট করে, তাহলে খুতবা নতুন করে

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৯১৬)।

২ সহীহ বুখারী (৬৩১), মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

৩ আল-ইনসাফ: (২/৩৮৯)।

শুরু করতে হবে। আর বিচ্ছিন্নতা দীর্ঘ না সংক্ষিপ্ত, তার মাপকাঠি হলো প্রচলিত প্রথা। একইভাবে খুতবা ও সালাতের মাঝেও ধারাবাহিকতা বজায় রাখা শর্ত। আর যদি ইমামের ওজু-পবিত্রতা অর্জনের প্রয়োজন হয়, তাহলে সে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং পূর্বে প্রদত্ত খুতবার উপর ভিত্তি করবে, যতক্ষণ না বিচ্ছিন্নতা দীর্ঘ হয়।^১

৫- উচ্চঃস্বরে খুতবা দেওয়া; এর কারণ হলো, খুতবা ওয়াজিব এবং জুমুআ শুদ্ধ হওয়ার শর্ত। আর উচ্চঃস্বরে খুতবা দেওয়া হলো তা আদায় ও এর উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম। আর খুতবা হলো ওয়ায ও নসীহত করা। আর যা ছাড়া কোনো ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, তাও ওয়াজিব।

৬- জুমুআ অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুসল্লির উপস্থিতি থাকা। কারণ, খুতবা এমন এক যিকর যার দিকে ধাবিত হওয়া ওয়াজিব, তাই উক্ত সংখ্যক মুসল্লির জন্য তা শ্রবণ করা আবশ্যিক।

চতুর্থ মাসয়ালা: খুতবার রুকনসমূহ:

১- মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান দ্বারা শুরু করা; জাবের ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন:

«كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَىٰ إِثْرِ ذَلِكَ...» الْحَدِيثُ [144].

^১ আল-মুগনি: (২/২৩০)।

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু‘আর দিন খুতবায় আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর গুণগান করতেন, অতঃপর বলতেন...” উক্ত হাদীসের শেষ প্রযুক্ত।^১

২- খুতবায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ অন্তর্ভুক্ত থাকা; কেননা খুতবাসমূহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পাঠ সাহাবী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমগণের নিকট একটি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ বিষয় ছিল।^২

২- তাতে উপদেশ ও আল্লাহ তা‘আলার তাকওয়া অবলম্বনের অসিয়ত থাকা; এর দলীল জাবের ইবন সামুরা রাঃ এর হাদীস, তিনি বলেন:

«كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَذْكُرُ النَّاسَ»؛

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুটি খুতবাহ ছিল, তিনি উভয় খুতবার মাঝে বসতেন, কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং মানুষকে উপদেশ দিতেন।”^৩;
কেননা মূলত এটিই খুতবার উদ্দেশ্য।

৪- কুরআনুল কারীমের কিছু অংশ তেলাওয়াত করা; জাবের ইবন সামুরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে:

«كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَذْكُرُ النَّاسَ».

১ সহীহ মুসলিম: (৮৬৭)।

২ দেখুন: ইবনুল কাইয়্যিমের 'জালাউল আফহাম', পৃষ্ঠা (৩৭১)।

৩ সহীহ মুসলিম: (৮৬২)।

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুটি খুতবাহ ছিল। তিনি উভয় খুতবার মাঝে বসতেন, কুরআন পাঠ করতেন এবং মানুষকে উপদেশ দিতেন।”

পঞ্চম মাসয়ালা: খুতবার সুন্নাতসমূহ:

১- মিস্বারের উপর অথবা কোনো উচ্চ স্থানে খুতবা প্রদান করা;

«فَقَدْ صُنِعَ لَهُ مَنبَرٌ، فَخَطَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» [147]

“কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য একটি মিস্বার তৈরি করা হয়েছিল এবং তিনি জুমার দিন তার উপর খুতবা প্রদান করেছিলেন।”^১ বহু সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্বারের উপর খুতবা দিতেন। আর ইমাম নববী রাহিমাল্লাহু এটি মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা উল্লেখ করে বলেন:^২ “সমস্ত আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, খুতবা মিস্বারের উপর হওয়া মুস্তাহাব”।^৩ কেননা, তা প্রচারের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর এবং মানুষ যখন খতীবকে দেখে, তখন তাদের ওপর উপদেশের প্রভাব বেশি হয়।

১ হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন: (২০৯৫) জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস থেকে।

২ দেখুন: ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজি আহাদীসি মানারিস সাবীল: (৩/৭৫) ও তৎপরবর্তী।

৩ আল-মাজমু' শারহুল মুহাযযাব: (৪/৫২৭)।

২- খুতবা প্রদানকালে খতীবের দাঁড়িয়ে থাকা; কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

{وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا...}

“আর যখন তারা দেখে ব্যবসা অথবা ক্রীড়া - কৌতুক তখন তারা আপনাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে যায়”... [আল-জুমুআ: ১১] আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ كَمَا تَفْعَلُونَ الْآنَ» [150].
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন, অতঃপর বসতেন, অতঃপর আবার দাঁড়াতেন, যেমন তোমরা এখন করে থাকো।¹

৩- খতীবের মুক্তাদিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে খুতবা প্রদান করা; এ মর্মে আব্দুল্লাহ ইবন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত,

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَنَا مِنْ مَنْبَرِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَلَّمَ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ مِنَ الْجُلُوسِ، فَإِذَا صَعِدَ الْمَنْبَرَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ سَلَّمَ» [151].

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমু‘আর দিনে যখন তার মিম্বরের নিকটবর্তী হতেন, তখন তার কাছে উপবিষ্টদেরকে সালাম দিতেন। অতঃপর মিম্বরে আরোহণ করে মানুষের দিকে মুখ করতেন, তারপর সালাম দিতেন”।²

1 সহীহ বুখারী (৯২০), মুসলিম (৮৬১)

2 এটি বাইহাকী সুনানে কুবরাতে (৫৭৪২) বর্ণনা করেছেন।

হাফিয ইবনু রজব বলেন: “ইমামের মুসল্লিদের দিকে মুখ করা এবং কিবলাকে পেছনে রাখা সর্বসম্মত বিষয়। দলীলসমূহও এর প্রতি নির্দেশ করে; কেননা তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে কথা বলেন, যাতে তারা তার কথা বুঝতে পারে। আর এ সবই সুন্নাহ। সুতরাং ইমাম যদি এর ব্যতিক্রম করেন, তবে তিনি সুন্নাহের ব্যতিক্রম করলেন, কিন্তু তার জুমা‘আ শুদ্ধ হয়ে যাবে”।¹

৪- খতীবের জন্য মুক্তাদিদের সামনে আসার সময় সালাম দেওয়া সুন্নাহ; কেননা জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ» [153].

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বারে আরোহণ করতেন, তখন সালাম দিতেন।”²

৫- মুয়াযযিন আযান শেষ করা পর্যন্ত মিম্বারে বসে থাকা সুন্নাহ; যেহেতু ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَلَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ» [154].

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি খুতবা দিতেন। তিনি মিম্বারে আরোহণ করে মুয়াজ্জিন (আযান) শেষ করা পর্যন্ত বসতেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। অতঃপর তিনি বসতেন এবং এ সময়

1 ফাতহুল বারী, ইবনে রজব (৮/২৫০)।

2 সুন্নাহে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং (১১০৯)।

কোনো কথা বলতেন না, অতঃপর পুনরায় দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন”।^১ এর সমর্থনে সাযিব ইবনু ইয়াযিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে, তিনি বলেন:

«إِنَّ الْأَذَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا» [155].

“নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর যুগে জুমু‘আর দিনের প্রথম আযানটি হতো তখন, যখন ইমাম জুমু‘আর দিন মিস্বরে বসতেন।”^২

৬- সাধ্যানুযায়ী খুতবা প্রদানকালে স্বর উঁচু করা; কেননা জাবের ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুতবা দিতেন, তখন তার চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেত, তার কণ্ঠস্বর উঁচু হয়ে যেত এবং তার ক্রোধ তীব্র হয়ে যেত। এমনকি তিনি যেন কোনো সৈন্যবাহিনীর সতর্ককারী, যিনি বলছেন:

«صَبَّحَكُمْ وَمَسَّكُمْ»

“সৈন্যবাহিনী তোমাদের উপর সকালে আক্রমণ করতে পারে, সৈন্যবাহিনী তোমাদের উপর সন্ধ্যায় আক্রমণ করতে পারে।”, (صَبَّحَكُمْ) অর্থাৎ: সৈন্যবাহিনী তোমাদের নিকট সকাল বেলায় আগমন করবে, এবং

^১ আবু দাউদ, হাদীস নং (১০৯২)

^২ হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন: (৯১৬)।

(مَسَّكُمْ) অর্থাৎ: তারা তোমাদের নিকট সন্ধ্যা বেলায় আগমন করবে। আর যে কাউকে সতর্ক করতে চায়, সে এই শব্দ দুটি বলতে পারে।^১

৭- দুই খুতবার মাঝে কিছু সময় বসা; কেননা ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন:

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَفْغُدُ بَيْنَهُمَا» [157].

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি খুতবা দিতেন আর দুই খুতবার মাঝে বসতেন”।^২

৮- খুতবা দুটি সংক্ষিপ্ত করা, দ্বিতীয়টি প্রথমটির চেয়ে সংক্ষিপ্ত হওয়া এবং সালাত লম্বা করা সুন্নাত; কারণ আশ্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«إِنَّ طَوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مِثْلُ -أَي: عِلَامَةٍ- مِنْ فَهْمِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ»

“নিশ্চয় কোনো ব্যক্তির সালাত দীর্ঘ হওয়া এবং তার খুতবা সংক্ষিপ্ত হওয়া তার ফিকহ (জ্ঞান)-এর পরিচায়ক। অতএব, তোমরা সালাত দীর্ঘ কর এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত কর।”^৩

৯- মুসলিমদের জন্য তাদের দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের দোয়া করা এবং মুসলিম শাসকদের সংশোধন ও তাওফীকের জন্য দোয়া করা সুন্নাত; নববী রাহিমাল্লাহু বলেন: “আর মুসলিমদের ইমাম ও

১ সহীহ মুসলিম: (৮৬৭)।

২ হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন: (৯২৮)।

৩ সহীহ মুসলিম: (৮৬৯)।

শাসকদের জন্য তাদের কল্যাণ ও সংশোধন, হক প্রতিষ্ঠায় সাহায্য, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও অনুরূপ বিষয়ের জন্য এবং ইসলামী সেনাবাহিনীর জন্য দোয়া করা সর্বসম্মতভাবে মুস্তাহাব।^১

আর ইমামের জন্য ইসতিসকার দু'আ ব্যতীত জুমু'আর খুতবায় দু'আর সময় উভয় হাত উঠানো শরী'আতসম্মত নয়। আর তার জন্য শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা মুস্তাহাব। এ মর্মে 'উমারাহ ইবনু রুআইবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বিশর ইবনু মারওয়ানকে মিস্বারের উপর উভয় হাত উঠাতে দেখে বললেন:

«قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ؛ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ» [160].

“আল্লাহ এ হাত দুটিকে কুৎসিত করুন! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি তার হাত দিয়ে এর চেয়ে বেশি কিছু করতেন না, অর্থাৎ তিনি তার তর্জনী দিয়ে ইশারা করলেন।”^২

১০- যিনি খুতবা প্রদান করেছেন তারই সালাতের ইমামতি করা। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এ দুটির দায়িত্ব পালন করতেন এবং তাঁর পরবর্তী খলীফাগণও অনুরূপ করতেন। আর কোনো ওযরের কারণে যদি একজন খুতবা দেন এবং

১ আল-মাজমু' শারহুল মুহাযযাব: (৪/৫২১)

২ সহীহ মুসলিম: (৮৭৪)।

অপরজন সালাতের ইমামতি করেন, তবে তা জায়েয হবে।^১

ষষ্ঠ মাসয়ালা: জুম'আর খুতবার অনুবাদ

যেসব দেশের অধিবাসী বা তাদের অধিকাংশই আরবী ভাষা জানে না, সেখানকার খতীবের জন্য তাদের নিজেদের ভাষায় খুতবা দেওয়া জায়েয; যাতে তারা খুতবা বুঝতে পারে, এর উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং এর অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান, উপদেশ ও নসিহত দ্বারা উপকৃত হতে পারে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কিছু প্রমাণিত হয়নি যা প্রমাণ করে যে, জুম'আর খুতবার জন্য আরবী ভাষা হওয়া শর্ত। বরং নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবী ভাষায় খুতবা দিতেন; কারণ তা ছিল তার এবং তার কওমের ভাষা।

খতীবের জন্য উত্তম হলো আরবী ভাষায় খুতবা দেওয়া, অতঃপর তা নিজ দেশের ভাষায় অনুবাদ করা, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবার অনুসরণে এবং এ মাসআলার মতভেদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য।

অনুবাদ করার ক্ষেত্রে শ্রোতাদের জন্য যা অধিকতর উপযোগী, সে অনুযায়ী খুতবার প্রতিটি অংশের পরপর অনুবাদের প্রতি খেয়াল রাখবে অথবা আরবি ভাষায়

^১ আল-মুগনী, ইবনু কুদামাহ: (২/২২৮)।

খুতবা শেষ হওয়ার পর সালাতের পূর্বে অনুবাদ করা হবে।

অনুরূপভাবে খুতবার তাৎক্ষণিক অনুবাদ করা, সম্প্রচার কেন্দ্রের মাধ্যমে তা প্রচার করা এবং আরবিনা-জানা মুসল্লিদের রিসিভারের মাধ্যমে তা গ্রহণ করা বৈধ। অনুবাদক বা শ্রোতা কারো পক্ষ থেকেই এটি নিষিদ্ধ অনর্থক কথার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে না; কারণ এতে সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং এর মাধ্যমে খুতবার উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

সপ্তম মাসআলা: খতীবের যোগ্যতাসমূহ:

মসজিদের খতীবকে মসজিদের স্তম্ভ ও শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। ইমামের মাধ্যমেই মসজিদ দাওয়াত প্রচার, সমাজকে সচেতন করা এবং মানুষকে তাদের দ্বীনের বিষয়ে জ্ঞানদান করার দায়িত্ব পালন করে। সুতরাং খতীব যদি আলেম, বুদ্ধিমান, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মানুষের প্রথা ও অবস্থা সম্পর্কে অবগত হন, তবে মসজিদের জামাআত ও এর মহল্লার অধিবাসীদের ওপর তার উত্তম প্রভাব ও উপকারী হয়। তিনি তাদের শিক্ষা দেন, পথপ্রদর্শন করেন এবং সকল কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করেন।

খুতবার শর্তাবলী পূরণকারী খতীবগণ একরূপই ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ই ছিলেন খতীব। অতঃপর তার খুলাফায়ে রাশেদীন, তারপর আমীরগণ, সেনাপতিগণ, আলেমগণ ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ। আর এটি প্রমাণ করে

যে, এ দায়িত্ব পালনকারীকে অবশ্যই দ্বীন, চরিত্র, জ্ঞান ও আচরণের দিক থেকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতে হবে।

আর এখানেই মানুষের জীবনে এই পেশার গুরুত্ব প্রকাশ পায়। কেননা খতীবদের যোগ্যতা তাদের সমাজে প্রতিফলিত হয় এবং তাদের দুর্বলতার প্রভাবও সেই সমাজগুলোতে প্রকাশ পায়। কারণ মসজিদই সমাজকে কথা ও কাজে মিল রাখার শিক্ষা দেয়। সুতরাং খতীব যদি ইলমে, বুদ্ধিতে বা ব্যক্তিত্বে দুর্বল হন অথবা মন্দ চরিত্র ও আচরণের অধিকারী হন, তবে তিনি উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি করেন। আর খতীবের দায়িত্ব যদি হয় মুসল্লিদেরকে কল্যাণ, পুণ্য ও সততার দিকে দিকনির্দেশনা দেওয়া, তবে একজন জাহেল খতীবের পক্ষে এই মহান দায়িত্ব সম্পাদন করা অত্যন্ত কঠিন।

কোনো খতীব জ্ঞান ও ব্যক্তিগত যোগ্যতার দিক থেকে এই দায়িত্বের শর্তাবলী পূরণকারী হতে পারেন, কিন্তু তিনি অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকেন যা তার কর্ম সম্পাদনের মানের উপর প্রভাব ফেলে।

অনুরূপভাবে, তিনি পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে খুতবা প্রস্তুত করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পান না। ফলে তিনি মানুষের সামনে এমন খুতবা নিয়ে উপস্থিত হন—যেমনটি ইবনুল কাইয়্যিম আল-জাওযিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন—যা অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর তাওহীদ সৃষ্টি করে না, তাঁর সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানও অর্জিত হয় না, পরকালের স্মরণ করিয়ে

দেয় না, আর নফসকে তাঁর ভালোবাসা ও তাঁর সাক্ষাতের ব্যাকুলতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না।^১

আর কখনো কখনো প্রবৃত্তি, অজ্ঞতা, ঝগড়া-বিবাদ অথবা নিন্দনীয় চরমপন্থা তার উপর প্রবল হয়; ফলে সে বস্তুনিষ্ঠতা, শিক্ষামূলক নির্দেশনা এবং প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

আর এই দ্বীনে মসজিদের মহান প্রভাব রয়েছে; কেননা তা হলো হেদায়াতের মিনার, যেখানে বান্দা তার রবের সাথে মিলিত হয়, তার ঈমান শক্তিশালী হয় এবং সে তার ভাইদের সাথে একত্রিত হয়, যাতে সকলে মিলে সৎগুণাবলী প্রচারে ও অসৎগুণাবলী প্রতিরোধে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারে। আর মসজিদ ততক্ষণ পর্যন্ত এ কাজে সক্ষম হবে না, যতক্ষণ না আল্লাহ তার জন্য এমন একজন ইমামের ব্যবস্থা করেন যার মধ্যে এই মহান পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ইলমী ও চারিত্রিক যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে এবং তিনি এই মহৎ দায়িত্বের কর্তব্যসমূহ পালন করেন।

খতীবের মাঝে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানগত যোগ্যতাসমূহ বিদ্যমান থাকা জরুরী:

১- আল্লাহর জন্য ইখলাসের সাথে আমল করা; যাতে তা আল্লাহ ও মানুষের নিকট সমর্থিত, সাহায্যপ্রাপ্ত, কবুল ও প্রিয় হয়।

^১ যাদুল মা'আদ ফি হাদি খাইরিল ইবাদ: (১/৪০৯)।

২- লৌকিকতা ও অহংকার থেকে দূরে থাকা; কেননা, সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে, যা সে নিয়ত করবে। আর যে ব্যক্তি এমন কিছু জাহির করে যা তার মধ্যে নেই, আল্লাহ তাকে লাস্তিত করেন।

৩- আল্লাহর কিতাবের হাফেয হওয়া, অথবা এর থেকে কিছু অংশ হিফয করা, এবং তার হিফযকৃত অংশের নিয়মিত মুরাজা'আ করা, আর প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াতের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশ থাকা।

৪- রিয়াদুস সালিহীন, আল-আরবাঈন আন-নাবাবিয়াহ, বুলুগুল মারাম অথবা অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাব থেকে কিছু সংখ্যক হাদীস মুখস্থ করা।

৫ - সঠিক আকীদা তথা সালাফে সালেহীনের আকীদা শিক্ষা করা।

৬ - দ্বীনের বিধান বিষয়ক ফিকহ শিক্ষা করা, বিশেষ করে ইবাদতের ফিকহ, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো তাহারাত, সালাত, যাকাত ও সিয়াম সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। অনুরূপভাবে মুআমালাত বা লেনদেন বিষয়ক ফিকহ শিক্ষা করা; যাতে সে উপার্জন ও ব্যয়ের নীতিমালা জানতে পারে, মানুষকে প্রতারণা, ধোঁকাবাজি ও বাতিল পন্থায় অন্যের সম্পদ গ্রহণ থেকে সতর্ক করতে পারে এবং তাদেরকেও ইসরাফ, অপব্যয়, কৃপণতা ও ব্যয়কুণ্ঠতা থেকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তাদের আর্থিক কার্যকলাপ কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত হয়।

৭- আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা, যাতে আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা নাযিল করেছেন তার অর্থসমূহ জানতে পারে। কেননা কুরআন আরবদের ভাষায় নাযিল হয়েছে।

৮- সীরাতে নববী, শামায়েলে মুহাম্মাদী এবং সালাফে সালাহীনের জীবন-চরিত অধ্যয়ন করা; কেননা এগুলোর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, সুন্দরতম অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত, উপকারী জ্ঞানভান্ডার এবং উচ্চতর ইসলামী সংস্কৃতি।

৯- নিজ দেশ এবং অন্যান্য দেশের গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমদের সম্পর্কে জানা; যারা সঠিক আক্বীদা, ইলম ও প্রজ্ঞার অধিকারী হিসেবে পরিচিত। আর দ্বীনের মাসআলা-মাসায়েল ও সমাজের সমস্যা সমাধানে তার প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে তাদের শরণাপন্ন হওয়া।

১০ - ইসলামী দলসমূহ ও তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস, বিভিন্ন চিন্তাধারা ও তার উদ্দেশ্য এবং ধ্বংসাত্মক মতবাদ ও তার লক্ষ্য সম্পর্কে জানা, যাতে আল্লাহ তাআলার কিতাব, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ এবং গবেষক মুসলিম আলেমগণের রচনার আলোকে সেগুলোর পর্যালোচনা করা, ভ্রান্তি খণ্ডন করা এবং বাতিল সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।

১১- মুসলিমদের বাস্তব অবস্থা, তাদের দুর্বলতা এবং তাদের উপর শত্রুদের আধিপত্যের বিষয়ে তার

মনোযোগ থাকতে হবে এবং এ বিষয়ে জ্ঞান রাখবে যে, এর কারণ হলো আল্লাহর সঠিক ও সরল পথ থেকে তাদের দূরে থাকা, আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর শরী'আতের আনুগত্যের ক্ষেত্রে দুর্বলতা। সুতরাং সে তাদেরকে এমন বিষয় শিক্ষাদানে সচেষ্টিত হবে যা তাদের দ্বীন ও দুনিয়ায় উপকারী হবে।

১২- বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাথে পরিচিত হবে, এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াতের কাজে কীভাবে তা থেকে উপকৃত হওয়া যায় তা জানবে। আর ব্যক্তি ও সমাজের জন্য এতে থাকা ঝুঁকি থেকে সতর্ক করবে।

আর জুমু'আর খতীবের মধ্যে যখন এই গুণাবলি বিদ্যমান থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলার অনুমতিক্রমে তা অবিচলতা ও ভারসাম্য সৃষ্টি করে।

প্রধান চারিত্রিক যোগ্যতাসমূহ:

১- মসজিদের খতীবের উচিত, তিনি যেন মসজিদের জামা'আত এবং তার মসজিদে যাতায়াতকারী এলাকাবাসী ও অন্যান্যদের জন্য একজন দায়ী ও শিক্ষক হবেন। সুতরাং তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে; কেননা তিনিই হলেন উম্মাহ ও নেতৃবৃন্দের জন্য সৎ আদর্শ, উত্তম নমুনা এবং সর্বোত্তম আদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (21)

“অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ, তার জন্য যে আশা রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের এবং আল্লাহকে বেশী স্মরণ করে। [আল-আহযাব, আয়াত: ২১]

আর নিজেকে ও তার মসজিদের মুসল্লিগণকে দুনিয়াবী ও রাজনৈতিক আলোচনা থেকে দূরে রাখবে এবং মসজিদকে ইলম ও ইবাদাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে।

২- নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও গোছানো থাকা, একইভাবে মসজিদের পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নবান হওয়া, এর জিনিসপত্র সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা, এর আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করা, এ ক্ষেত্রে অপচয় থেকে বিরত থাকা এবং মসজিদের সাজসজ্জা পরিহার করা।

৩- উত্তম আদর্শ ও আচরণ ধারণ করা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণ করে দাড়ি লম্বা রাখা ও গোঁফ খাটো করা, টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানো থেকে বিরত থাকা, গাভীর্য ও প্রশান্তি অবলম্বন করা এবং সালাফে সালিহীন (রাহিমাহুমুল্লাহ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা।

৪- কোমল, সহনশীল ও দয়ালু হওয়া; কেননা কোমলতা কোনো কিছুতে থাকলে তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এবং কোনো কিছু থেকে তা বিদূরিত হলে তাকে কলুষিত করে, যেমনটি হাদীসে এসেছে; আয়েশা

রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ»

“নিশ্চয় কোমলতা যেকোনো কিছুকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। আর কোনো কিছু থেকে কোমলতা বিদূরিত হলে তা তাকে কলুষিত করে।”^১

সুতরাং মসজিদে আগত কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে যখন কোনো ভুল প্রকাশ পায়, তখন খতীবের উচিত নয় তাকে তিরস্কার করা, বরং তাকে নমনীয়তার সাথে নসিহত করবে এবং উত্তম পন্থায় শিক্ষা দেবে; এ মর্মে মুআবিয়া ইবনে হাকাম আস-সুলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

بَيْنَمَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَرَأَمَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاتَّكَلْ أَمْيَاهُ، مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَادِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَبَايَيْ هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي -أَيُّ: مَا فَهَرَنِي وَلَا نَهَرَنِي- وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»

“একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম; এমন সময় লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি বললাম, ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’। তখন লোকেরা আমার দিকে তাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। আমি বললাম, ‘হায়!

১ সহীহ মুসলিম: (২৫৯৪)।

আমার মা আমাকে হারিয়ে ফেলুক! তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে আছ?’ তখন তারা নিজ নিজ উরুতে হাত চাপড়াতে লাগল। আমি যখন দেখলাম যে, তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে, তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষ করলেন— আমার পিতা-মাতা তার জন্য কুরবান হোক—আমি তার আগে বা পরে তার চেয়ে উত্তম কোনো শিক্ষক দেখিনি। আল্লাহর শপথ! তিনি আমাকে তিরস্কার করেননি, প্রহার করেননি এবং গালিও দেননি। তিনি বললেন: “এই সালাতে মানুষের কোনো কথা বলা বৈধ নয়। এটা তো কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠের স্থান।”^১

৫- নম্র ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া, যাতে মানুষ তার নিকট একত্রিত হয়ে তার স্নেহ, সহযোগিতা ও জ্ঞান থেকে উপকৃত হতে পারে এবং তাদের বিপদ-আপদ ও প্রয়োজনে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারে। আর মসজিদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সবকিছুর সর্বোচ্চ মাকামে ছিলেন, যেমন আল্লাহ তা‘আলা তার সম্পর্কে বলেছেন:

^১ সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৫৩৭)

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (159)

“আল্লাহ্র দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন; যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তবে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর আপনি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করবেন; নিশ্চয় আল্লাহ (তার উপর) নির্ভরকারীদের ভালবাসেন।” [আলে ইমরান: ১৫৯]

০৬- সবার ও ইয়াকীন অবলম্বন করা; যাতে সে তার মসজিদ ও জামাআতের মাঝে ইমামতের মর্যাদা লাভের যোগ্য হয়; কেননা সবার ও ইয়াকীন বান্দাকে দ্বীনের ইমামতের মর্তবায় পৌঁছে দেয়, আল্লাহ তাআলা বলেন:

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ (24)

“আর আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে হেদায়াত করত; যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর তারা আমার আয়াতসমূহে দৃঢ় বিশ্বাস রাখত।” [আস-সাজদাহ: ২৪]

৭- তাকে অবশ্যই কথা-বার্তায় সত্যবাদী হতে হবে, চায় তা জুমুআর খুতবায় হোক, কিংবা শিক্ষা ও

উপদেশের ক্লাসে, অথবা মানুষের সাথে তার কথাবার্তায় হোক, যেন সে সত্যবাদী, সঠিক পথপ্রাপ্ত ও সফলকামদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কেননা হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এসেছে, তিনি বলেছেন:

«عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ؛ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا»

“তোমরা অবশ্যই সত্য অবলম্বন করবে; কেননা সত্য সংকর্মের দিকে পরিচালিত করে আর সংকর্ম পরিচালিত করে জান্নাতের দিকে। কোনো ব্যক্তি যখন সত্য বলতে থাকে এবং সত্যের প্রতি সদা আগ্রহী থাকে, অবশেষে সে আল্লাহর নিকট ‘সিদ্দীক’ (অতি সত্যবাদী) হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকবে; কেননা মিথ্যা অন্যায়ের দিকে নিয়ে যায়, আর অন্যায় জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। কোনো ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যার প্রতিই আগ্রহী থাকে, অবশেষে সে আল্লাহর নিকট ‘কায্যাব’ (অতি মিথ্যাবাদী) বলে লিপিবদ্ধ হয়।”^১

আর মিথ্যাচার হলো অনিষ্ট ও বিপদ, এবং সবচেয়ে বড় মিথ্যা হলো আল্লাহ তা‘আলার ওপর মিথ্যারোপ

^১ সহীহ বুখারী (৬০৯৪), মুসলিম (২৬০৭), আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

করা ও না জেনে তাঁর সম্পর্কে কথা বলা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ﴾ (33)

“বলুন, নিশ্চয় আমার রব হারাম করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা। আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরীক করার কোনো সনদ তিনি নাযিল করেননি। আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না।” [সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ৩৩]

এই মহান আয়াতটি নিম্ন থেকে উচ্চ ক্রমানুসারে সবচেয়ে বড় গুনাহগুলোকে একত্রিত করেছে। আর তা হলো, আল্লাহর নাম, তাঁর গুণাবলী ও তাঁর শরী'আত সম্পর্কে না জেনে কথা বলা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যারোপ করা সবচেয়ে বড় মিথ্যা ও জঘন্যতম গুনাহ। এটি অন্যতম একটি কবীরাহ গুনাহ, যার কর্তাকে জাহান্নামের হুমকি দেওয়া হয়েছে। এ মর্মে মুগীরাহ ইবন শু'বাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি:

«إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَرَّأْ مَفْعَدَهُ
مِنَ النَّارِ»

“নিশ্চয় আমার ওপর মিথ্যারোপ করা অন্য কারো ওপর মিথ্যারোপ করার মতো নয়। যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়।”^১

আর মিথ্যা পরিহার করবে, যদিও তা ভালো কাজে উৎসাহিত করা এবং মন্দ কাজ থেকে ভীতি প্রদর্শনের মতো সং উদ্দেশ্যেও হয়, যেমনটি কোনো কোনো বক্তা করে থাকেন। কেননা এটি এমন একটি নিকৃষ্ট কাজ, যাতে কোনো কল্যাণ বা হিদায়াত নেই। এর বক্তা সওয়াবপ্রাপ্ত হওয়ার পরিবর্তে গুনাহগার এবং লাভবান হওয়ার পরিবর্তে পাপী হয়।

৮- মন্তব্য বর্ণনায় আমানতদার হবে, সংবাদের বিশুদ্ধতা যাচাই করবে, গুজব গ্রহণে তাড়ালুড়া করবে না এবং কেবল নির্ভরযোগ্য মতের উপর নির্ভর করবে। আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে এ ব্যাপারে তাঁর বাণীতে নির্দেশ দিয়েছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدْمِينَ﴾ (6)

“হে ঈমানদারগণ! যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ, এ আশঙ্কায় যে, অজ্ঞতাবশত তোমরা কোনো সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসবে,

^১ সহীহ বুখারী (১২৯১), মুসলিম (৪)

ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে।” [আল-হুজুরাত: ৬]

৯- মানুষের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখার ব্যাপারে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করা। কেননা, যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে গোপন রাখবেন। আর যে মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ান, এমনকি তাকে তার ঘরের ভেতরেও অপদস্থ করেন। এ মর্মে আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।”

আবু বারযাহ আল-আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:^১

«يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بَلِسَانِهِ، وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تَعْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ اتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ»

“হে ঐ সব লোক যারা শুধুমাত্র মুখে ঈমান এনেছে, কিন্তু ঈমান এখনো অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলিমদের গীবত করবে না এবং দোষত্রুটি অনুসন্ধান

১ সহীহ বুখারী (২৪৪২), মুসলিম (২৫৮০)।

করবে না। কারণ যারা তাদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়াবে আল্লাহও তাদের দোষত্রুটি খুঁজবেন। আর আল্লাহ কারো দোষত্রুটি অনুসন্ধান করলে, তাকে তার বাড়ির মধ্যেই অপদস্থ করেন।”^১

অষ্টম মাসআলা: খুতবা ও খতীবের

আদবসমূহ:

১- জুমুআর খুতবাকে কোনো ব্যক্তি, দল, সংস্থা বা অন্য কারো প্রচারণার হাতিয়ার হওয়া থেকে মুক্ত রাখা এবং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা‘আলা, তাঁর দ্বীন, তাঁর দাওয়াতের প্রচার ও তাঁর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য হওয়া আবশ্যিক। আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (18)

“আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। কাজেই আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।” [আল-জিন: ১৮]

২- খতীব খুতবাকে এমন দীর্ঘায়িত করবেন না, যা শ্রোতাদের জন্য কষ্টকর হয় এবং খুতবা শোনার ক্ষেত্রে তাদের অনাগ্রহী করে তোলে। আবার, এমন সংক্ষিপ্তও করবেন না, যা মূল বিষয়বস্তুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা অসম্পূর্ণ রাখে।

৩- খতীবের উচিত খুতবা প্রদানের সময় শ্রোতাদের অবস্থা ও গ্রহণ করার যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখা। সুতরাং তিনি সাধারণ মানুষের জন্য তাদের বোধগম্য

^১ আবু দাউদ, হাদীস নং (৪৮৮০)

ভাষায় কথা বলবেন এবং তাদের উপলব্ধির বাইরের কঠিন শব্দ পরিহার করবেন; মধ্যম শ্রেণীর শ্রোতাদের জন্য মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবেন এবং বিশেষ শ্রেণীর শ্রোতাদের জন্য মার্জিত ভাষা ব্যবহার করবেন। ফলে তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের কাছেই প্রজ্ঞাবান হিসেবে থাকবেন, যিনি প্রত্যেক বিষয়কে তার যথাযথ স্থানে রাখেন। আর সর্বাবস্থায় তিনি তার কথায় সকল প্রকার বাতিল অলংকারপূর্ণ বক্তব্য পরিহার করবেন।

৪- এমন সব মতবিরোধপূর্ণ বিষয় পরিহার করবে যা শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে; কেননা খতীবের মৌলিক দায়িত্ব হলো মানুষকে শিক্ষা দেওয়া, হকের উপর তাদের অন্তরগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাদের মধ্যকার অনৈক্যের কারণসমূহ দূর করা।

৫- ছন্দ মেলানো বা অতিরিক্ত গভীরতায় যাওয়ার চেষ্টা করবে না, বরং তার মূল উদ্দেশ্য হবে সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় উপকারী অর্থ পৌঁছে দেওয়া।

৬- নিন্দনীয় ও কষ্টকল্পিত তাকলীদ এবং প্রসিদ্ধ খতীবদের ব্যক্তিত্ব নকল করা থেকে বিরত থাকবে; কেননা তা অন্তরে অস্বস্তি ও অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে।^১

^১ দেখুন: আবদুল্লাহ ইবন দাইফিল্লাহ আর-রুহাইলী-এর "উসলুবি খুতবাতিল জুমু'আ", (পৃষ্ঠা: ১২, ২০, ২২), এবং আমীর ইবন মুহাম্মাদ আল-মাদারী-এর "খামসুন ওয়াসিয়াতান ওয়া ওয়াসিয়াহ লিতাকুনা খাতীবান নাজিহান", (পৃষ্ঠা: ৩৩, ৭৩, ৮৭)।

নবম মাসআলা: খুতবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

জুমু'আর খুতবার লক্ষ্য হওয়া উচিত নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা:

১- তাওহীদের মূলনীতি, এর গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণনা এবং শিরকের সকল প্রকার, রূপ ও মাধ্যম থেকে সতর্ক করা।

২- আল্লাহ তা'আলা, আখিরাতে তাঁর হিসাব ও প্রতিদান এবং এমন রব্বানী বিষয়াদি সম্পর্কে স্মরণ করানো ও উপদেশ প্রদান করা; যা দ্বারা অন্তরসমূহ উজ্জীবিত হবে, আর কল্যাণের দিকে আহ্বান, ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা।

৩- মুসলিমদেরকে আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে তাদের দ্বীনের হাকীকতসমূহ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান প্রদান করা ও শিক্ষা দেওয়া, সেই সাথে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন থেকে আখলাক ও আদবের সুরক্ষার প্রতি যত্ন নেওয়া।

৪- ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করা এবং এর বিরোধীরা মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য যে সব সন্দেহ ও বাতিল বিষয় উত্থাপন করে, সেগুলোকে বিতণ্ডা ও গালিগালাজ এড়িয়ে যুক্তিগ্রাহ্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় খণ্ডন করা।

৫- উম্মতের মৌলিক নীতিমালা হিসেবে সঠিক ইসলামকে উপস্থাপন করে ধ্বংসাত্মক ও বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারার মোকাবেলা করা, যে নীতিমালাকে আল্লাহ

উম্মতের জন্য মনোনীত করেছেন এবং উম্মতও নিজেদের জন্য দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে; সাথে এর ব্যাপকতা, ভারসাম্য, গভীরতা ও ইতিবাচকতার মতো বৈশিষ্ট্যসমূহও তুলে ধরা।

৬- সমাজের ব্যাধিগুলোর চিকিৎসার প্রতি গুরুত্বারোপ এবং এর সমস্যাগুলির জন্য মহিমাম্বিত ইসলামী শরীয়ত থেকে উৎসারিত সমাধান পেশ করার মাধ্যমে খুতবাকে জীবন ও মানুষের বাস্তবতার সাথে যুক্ত করা। সাথে আকিদা ও তার সংস্কার, ইসলাম ও ঈমানের রুকনসমূহ, মুসলিম নারী ও পরিবারের বিষয়াদি এবং মানুষের প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সমূহের প্রতি মনোযোগ প্রদানের করা।

৭- বছর জুড়ে আগত বিভিন্ন উপলক্ষ, যেমন রমযান, হজ ও অন্যান্য বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া; যা শ্রোতাদের মনকে আকৃষ্ট করে এবং সে বিষয়ে এমন জ্ঞানার্জনে তাদেরকে আগ্রহী করে তোলে যা তাদের পথকে আলোকিত করবে।

৮- মুসলিমদের মাঝে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব রূপকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং মুসলিমদের বিভক্তকারী বর্ণবাদ, মাযহাবগত, আঞ্চলিকতা ও অন্যান্য সকল প্রকার গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতাকে প্রতিহত করা।

দশম মাসয়ালা: খুতবা প্রস্তুত করার পদ্ধতি:

খতীবের উচিত তার খুতবা নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা:

সাধারণত খুতবা তিনটি অংশে বিভক্ত থাকে: ভূমিকা, মূল বিষয় এবং উপসংহার। এগুলো এমন উপাদান যা লেখা বা উপস্থাপনের সময় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় না, বরং এগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও সুসংগত। খতীবের যোগ্যতা, জ্ঞানের গভীরতা এবং অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে এগুলোর পারস্পরিক বন্ধন শক্তিশালী হয়, যার ফলে খুতবার অংশগুলো সুশৃঙ্খল হয় এবং এর গঠন সুদৃঢ় হয়।

এই শৃঙ্খলা ও সুবিন্যাস অর্থকে সুস্পষ্ট ও উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে, এবং তা বক্তার প্রতি শ্রোতাদের উত্তম মনোযোগ এবং মজলিসে উপস্থিতদের পরিপূর্ণ একাগ্রতা নিশ্চিত করে।

ভূমিকা: খতীবের উচিত তার ভূমিকা ও সূচনার প্রতি যত্নবান হওয়া। এজন্য তিনি এমন প্রারম্ভিক বাক্য উপস্থাপন করবেন যা শ্রোতার কাছে খুতবার উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে, মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং অন্তরকে প্রস্তুত করে। আর তা হতে পারে ভীতি প্রদর্শনকারী অথবা উৎসাহ প্রদানকারী কুরআনের আয়াত কিংবা কিছু প্রাঞ্জল নববী হিকমত দ্বারা। সূচনা হলো প্রথম বিষয় যা খতীব তার শ্রোতাদের সামনে পেশ করেন। সুতরাং তিনি যদি সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যমে শ্রোতাদের চমৎকৃত করতে পারেন, তবে তারা আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে তার খুতবার বাকি অংশ অনুসরণ করতে সক্ষম হবে।

বক্তব্যের শুরুতে বক্তার উদ্দেশ্য নির্দেশক কথা থাকা উচিত। আর এটা সুবিদিত যে, জুম'আর খুতবা আল্লাহর প্রসংশা, তাঁর গুণগান, শাহাদাতাইন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত ও সালাম দ্বারা শুরু হয়। সুতরাং এর জন্য সুন্দর শব্দ চয়নের মধ্যেই খুতবার বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের প্রতি নির্দেশ থাকে।

বিষয়বস্তু: এটিই খুতবার প্রধান উদ্দেশ্য। কখনো কখনো খুতবার শুরুতেই বিষয়বস্তুটি সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া সমীচীন হতে পারে। যেমন এভাবে বলা যে, 'আজ আমি আপনাদের সামনে অমুক বিষয়ে আলোচনা করতে চাই...'। বিশেষত যখন তা এমন কোনো চলমান বিষয় হয়, যা নিয়ে সমাজে আলোচনা চলছে এবং মানুষ সে বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রত্যাশা করে।

আবার কখনো কখনো বিষয়টি সরাসরি বলা সমীচীন হয় না, কারণ তা হয়তো স্পর্শকাতর অথবা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী। এ অবস্থায় খতীবের উচিত বিষয়টিতে পর্যায়ক্রমে প্রবেশ করা এবং পরোক্ষভাবে তা উপস্থাপন করা, যাতে তিনি শ্রোতাদেরকে একটি যৌক্তিক ধারাবাহিকতায় নিয়ে গিয়ে উত্তেজনা ও বিভেদ এড়িয়ে ভারসাম্য ও পরিমিতিবোধের সাথে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেন। এর মাধ্যমে খতীব শ্রোতাদের মনকে প্রস্তুত করার লক্ষ্য অর্জন করেন, যদি তারা বিষয়টি

থেকে বিমুখ থাকে অথবা বিষয়টি তাদের কাছে অপরিচিত হয়।

আর খুতবার বিষয়বস্তু সাধারণত দুটি মৌলিক স্তরের উপর নির্মিত, যথা: ব্যাখ্যা এবং দলিল।

আর ব্যাখ্যা হলো: আলোচ্য বিষয়ের সংজ্ঞা এবং এর গুণাবলী, বিশেষত্ব ও উপকারিতাসমূহ উল্লেখ করা।

আর দলীল পেশ হলো: কোনো বিষয়কে শক্তিশালী করার জন্য সাধারণত দলীল, যুক্তি, প্রমাণ ও সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। আর এই দলীল-প্রমাণ সাধারণত কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের উক্তি থেকে হয়ে থাকে। পাশাপাশি প্রেক্ষাপটের চাহিদা ও আলোচনার সাথে সংগতিপূর্ণ কিয়াস ও শিক্ষাগ্রহণের জন্য কিছু বাস্তব ঘটনা ও কাহিনীও উল্লেখ করা। এ ক্ষেত্রে এমন সব প্রসিদ্ধ ইমাম ও প্রজ্ঞাবানদের থেকে উদ্ধৃতি পেশ করাও উপকারী, যারা সততা, ইমামত, উত্তম চরিত্র, দুনিয়াবিমুখতা, সাহসিকতা ও তাকওয়ার গুণে পরিচিত ছিলেন।

খুতবার উপসংহার: খতীব তার বিষয়বস্তু উপস্থাপন শেষে, একটি উপযুক্ত উপসংহারের মাধ্যমে খুতবা শেষ করা উত্তম, যা তার চিন্তাভাবনাগুলোকে একত্রিত করবে এবং ভিন্ন শব্দচয়ন ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে তার বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ করবে, কারণ এই অবস্থায় দীর্ঘায়িত করা বিরক্তি নিয়ে আসে এবং চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে।

আর এতে নতুন কোনো ধারণা এবং নতুন দলিল থাকা সমীচীন নয়; কেননা তখন তা আর উপসংহার থাকে না, বরং খুতবারই একটি অংশ এবং তার বর্ধিতাংশে পরিণত হয়ে যায়।

উপসংহারকে তার অভিব্যক্তি ও প্রভাবের দিক থেকে শক্তিশালী হতে হবে, কারণ এটিই সর্বশেষ বিষয় যা শ্রোতার কর্ণগোচর হয় এবং তার অন্তরে গেঁথে যায়। আর এর গঠন যদি হয় দুর্বল এবং উপস্থাপনা যদি হয় নিষ্প্রাণ, তবে খুতবার উপকারিতাই নষ্ট হয়ে যায়।

উপসংহার এমন কিছু কুরআনের আয়াতও হতে পারে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয় নি; যা উৎসাহ প্রদান, ভীতি প্রদর্শন অথবা দলীল-প্রমাণের ক্ষেত্রে খুতবার বিষয়বস্তুকে একত্রিত করে। আবার তা এমন নববী হাদীসও হতে পারে, যা কুরআনের আয়াতের মতোই ভাবার্থ প্রকাশ করে। কিংবা তা হতে পারে খুতবার মূল উপাদানগুলো ভিন্ন আঙ্গিকে এবং সুস্পষ্ট, সমন্বিত ও শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারকারী পদ্ধতিতে পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমে।

খতীবের দুটি বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত, আর তা হলো: বিষয়বস্তুর সমন্বয় এবং নতুনত্ব ও পরিবর্তন।

বিষয়বস্তুর সমন্বয় হল: একটি মাত্র বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, যার বিভিন্ন দিকগুলো পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরা হবে, শব্দচয়ন হবে পরিমার্জিত এবং আলোচনা হবে গভীর। কারণ একই আলোচনায় একাধিক বিষয় ও বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করে,

একটি অপরটিকে ভুলিয়ে দেয় এবং তা বিরক্তিকর দীর্ঘায়ন, স্নান চিত্র ও অগভীর আলোচনার দিকে নিয়ে যায়।

নতুনত্ব ও পরিবর্তন: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার সকল খুতবা যেন নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। বরং তিনি তার বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য আনবেন; যাতে তা শরীয়তের সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন তাওহীদ, ইবাদাত, মু'আমালাত, আখলাক ইত্যাদি।

আর তিনি যেন তার পদ্ধতি ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে একটিমাত্র রীতিতে সীমাবদ্ধ না থাকেন; বরং তা হবে কখনও প্রশ্নবোধক, আবার কখনও বর্ণনামূলক, উদাহরণ-উপমা সমৃদ্ধ এবং প্রজ্ঞা ও রহস্য অনুসন্ধানী। সেই সাথে সমাজের বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত থাকা, মানুষের প্রয়োজন অনুধাবন করা এবং তাদের উপর এসব পরিবর্তনের প্রভাবের সাথে সঙ্গতি রেখে তাদেরকে দিকনির্দেশনা ও জ্ঞান দান করবেন।¹

চতুর্থ অধ্যায়: মসজিদের বিধানসমূহ

প্রথম অনুচ্ছেদ: মসজিদের সংজ্ঞা

শরয়ী পরিভাষায় মসজিদ হল: এমন স্থান যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত, জুমা ও অন্যান্য সালাত আদায় করা হয় এবং সেখান থেকে আযান দেওয়া হয়।

¹ দেখুন: মানহাজ ফী ই'দাদি খুতবাতিল জুমু'আহ, লিদ দুকতুর সালিহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু হুমাইদ: (পৃ. ২২) ও তৎপরবর্তী অংশ।

একে মসজিদ বলা হয়; কারণ তা আল্লাহ তাআলার জন্য সিজদা করার স্থান।

মসজিদ ও মুসাল্লার পার্থক্য

মসজিদ হলো এমন স্থান যা স্থায়ীভাবে ফরয সালাত আদায়ের জন্য খাস করা হয়েছে এবং সে লক্ষ্যে ওয়াকফকৃত। পক্ষান্তরে মুসাল্লা হলো যা অস্থায়ী সালাতের জন্য নির্ধারণ করা হয়; যেমন বিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি ও সফরের রাস্তার সালাতের স্থান ইত্যাদি, এবং তা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য ওয়াকফ করা হয়নি। আর মুসাল্লায় প্রবেশের ক্ষেত্রে তাহিয়াতুল মসজিদ সুন্নাত নয়, বরং তা মসজিদে প্রবেশের ক্ষেত্রেই সুন্নাত।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মসজিদ নির্মাণ করা ও তার ফযিলত

মসজিদ হলো যমীনের সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, যেখানে সর্বোত্তম ইবাদত সালাত আদায় করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:

(فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ 36 رَجَالٌ لَا تُلْهِيمُهُمْ تجرّةً وَلَا بَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ 37)

“সে সব ঘরে যাকে সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় তাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে,

সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় কোনোটিই আল্লাহর স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সে দিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। [আন-নুর: ৩৬-৩৭]

আর আল্লাহ তা'আলা সম্মান ও মর্যাদাস্বরূপ মসজিদসমূহকে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। তিনি বলেন:

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ...}

“আর তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর মসজিদগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাঁধা দেয়” ... [আল-বাকারাহ: ১১৪], তিনি আরো বলেছেন:

{وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝ 18}

“আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। কাজেই আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।” [আল-জিন: ১৮]

এজন্যই শরীয়ত বস্তুগত দিক থেকে ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে এটি নির্মাণ ও আবাদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{إِنَّمَا يَعْزَمُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا لِلَّهِ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝ 18}

“তরাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য

কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হবে সংপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।” [আত-তাওবাহ: ১৮]

উসমান ইবনু ‘আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ একটি ঘর নির্মাণ করেন।”^১

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْصَصِ قَطَاةٍ، أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কবুতরের মত এক পাখির বাসার মতো বা তার চেয়েও ছোট একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করে দেন।”^২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«وَلَوْ كَمَفْصَصِ قَطَاةٍ»

“কাতাহ পাখির বাসার সমপরিমাণ হলেও।” অর্থাৎ, মাদী পাখি ডিম পাড়ার জন্য মাটিতে যে স্থান তৈরি

^১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৪৫০), মুসলিম, হাদীস নং (৫৩৩)।

^২ সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং (৭৩৮)। আল-বুসিরী (রহ.) ‘আয-যাওয়াইদ’ (১/৯৪)-এ বলেছেন: এর সনদ সহীহ।

করে। এর দ্বারা ক্ষুদ্রতার বিষয়টি তুলে ধরা উদ্দেশ্য, যাতে কেউ তার নির্মিত মসজিদকে তুচ্ছ মনে না করে, যদিও তা অত্যন্ত ছোট হয়।

এর মধ্যে ঐ ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হবে যে মসজিদ নির্মাণে একটি ইট বা মাটি দিয়ে হলেও অবদান রেখেছে, অথবা নিজ হাতে তাতে কাজ করেছে, অথবা শ্রমিকদের পারিশ্রমিক পরিশোধ করেছে এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজ, যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে তার শ্রম বা সম্পদ দিয়ে মসজিদ নির্মাণে সাহায্যকারী হিসেবে গণ্য করা হয়, যদি সে এর ওপর প্রতিদান লাভের প্রত্যাশায় তা করে থাকে। এর প্রতিদান হলো, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে এর মতো অথবা এর চেয়েও প্রশস্ত একটি ঘর নির্মাণ করে দেবেন; কেননা জান্নাতের ঘরের সাথে দুনিয়ার ঘরের কোন তুলনা হয় না এবং উভয়ের মধ্যে কোনো সাদৃশ্যও নেই। আর তা আল্লাহ কর্তৃক সচ্ছলতা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে কল্যাণকর কাজে দ্রুত অংশগ্রহণ করতে এবং এই জীবনের সুযোগকে কাজে লাগাতে উৎসাহিত করে। ফলে সে তার আখিরাতের জন্য এমন কিছু অগ্রিম প্রেরণ করে, যার সাওয়াব সে তার রবের কাছে বহু গুণে বর্ধিত অবস্থায় পাবে।¹

¹ দেখুন: ফুসূল ওয়া মাসাইল তাতাআল্লাকু বিল-মাসাজিদ, শাইখ বিন জিবরীন রাহিমাহুল্লাহ (পৃ: ১৪)।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ এবং তার ফযিলত

মসজিদ আবাদ করার ব্যাপক অর্থ বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার আবাদকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং তা মসজিদ নির্মাণ ও তার সংস্কার, তাতে আলোর ব্যবস্থা ও কার্পেট বিছানো, তার খেদমত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করা, তাতে আল্লাহর ইবাদত করা, তার জন্য ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিয়োগ দেওয়া, তাতে যিকিরের হালাকার ব্যবস্থা করা—যেমন কুরআন, ফিকহ, তাফসীর, হাদীস ও অন্যান্য উপকারী জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া—, তাতে কর্মরতদের জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করা এবং মসজিদের কল্যাণে তার জন্য ওয়াকফ করা; যেমন ইমাম, মুয়াযযিন, শিক্ষক ও ইলম অন্বেষণকারী ছাত্রদের জন্য বাসস্থান ওয়াকফ করা, ওযুখানা তৈরি করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য কল্যাণকর কাজ করাকে শামিল করে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ (18)

“তরাই তো আল্লাহর মসজিদের আবাদ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হবে সৎপথ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।” [আত-তাওবাহ: ১৮]

এই মহান আয়াতটি তাদের ঈমানকে সাব্যস্ত করেছে, যারা মসজিদে সালাত আদায়, তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং এর জীর্ণ অংশ সংস্কার করার মাধ্যমে মসজিদ আবাদ করে থাকে।¹

চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মসজিদসমূহকে পবিত্র রাখা এবং ময়লা-আবর্জনা থেকে তাকে রক্ষা করা।

মসজিদসমূহ যেহেতু ইবাদত এবং আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভের স্থান, সেহেতু এগুলোকে নোংরা-আবর্জনা, অপবিত্রতা এবং বর্জ্য পদার্থ থেকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করার নির্দেশ এসেছে, যাতে তা পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য ও শোভা লাভ করে।

শায়খ ইবনুস সা‘দী রাহিমাল্লাহু এই আয়াতের তাফসীরে বলেন:

﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (36)

“সে সব ঘরে যাকে সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে” [সূরা আন-নূর, আয়াত: ৩৬]। তিনি বলেন:

﴿...أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ...﴾

...“যাকে সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে”... এই হলো মসজিদের বিধানসমূহের সমষ্টি।

¹ দেখুন: মুহাম্মদ আল-আরফাজ রচিত ‘আল-মাশরুউ ওয়াল-মামনুউ ফিল-মাসজিদ’ (পৃষ্ঠা: ৯)।

কাজেই এর মর্যাদা সমুন্নত রাখার অন্তর্ভুক্ত হলো: তা নির্মাণ করা, ঝাড়ু দেওয়া এবং নাপাকি ও ময়লা থেকে পরিষ্কার রাখা, যারা নাপাকি থেকে বেঁচে থাকে না এমন পাগল, শিশু-কিশোর ও কাফিরদের থেকে তা রক্ষা করা এবং মসজিদের ভেতরে অনর্থক কথাবার্তা ও আল্লাহর যিকির ব্যতীত উচ্চস্বরে কথা বলা থেকে পবিত্র রাখা।^১

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, এক কালো মহিলা মাসজিদে ঝাড়ু দিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে না পেয়ে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তারা বললেন, সে মারা গেছে। তিনি বললেন:

«أَفَلَا كُنْتُمْ أَذُنْتُمْوَنِي» قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَرُوا أَمْرَهَا، فَقَالَ: «دَلُونِي عَلَى قَبْرِهَا» فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ»

“তোমরা আমাকে কেন জানালে না।” তারা যেন তার বিষয়টিকে তুচ্ছ মনে করেছিল। অতঃপর তিনি বললেন, “আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও।” তারা তাঁকে তা দেখিয়ে দিলে তিনি তার ওপর সালাত পড়লেন। তারপর তিনি বললেন, “নিশ্চয় এই কবরগুলো এর অধিবাসীদের জন্য অন্ধকারে পরিপূর্ণ, আর আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর আমার সালাত আদায়ের কারণে তাদের জন্য তা আলোকিত করে দেন।”^২

^১ তাফসীরু আস-সা‘দী (পৃ: ৫৬৯।)

^২ সহীহ বুখারী (৪৬০), মুসলিম (৯৫৬)

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মসজিদে ছিলাম। এমন সময় এক বেদুঈন এসে মসজিদে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বললেন, ‘থামো, থামো’। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

«لَا تُزْرِمُوهُ - أَي: لَا تَقْطَعُوا عَلَيْهِ بَوْلَهُ - دَعُوهُ»

“তাকে থামিও না - অর্থাৎ তার পেশাব বন্ধ করো না - তাকে ছেড়ে দাও” অতঃপর তারা তাকে ছেড়ে দিল যতক্ষণ না সে পেশাব শেষ করল। তারপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন:

«إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْفَذْرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ»

“নিশ্চয় এ মসজিদসমূহ পেশাব ও নোংরা-আবর্জনার স্থান নয়। এগুলো তো মহান আল্লাহর যিকির, সালাত ও কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য।” অতঃপর তিনি কওমের একজনকে আদেশ করলে, সে এক বালতি পানি নিয়ে এসে তার উপর ঢেলে দিল।^১

এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই যে, পেশাব এবং অনুরূপ বস্তুসমূহ সেসব নাপাকির অন্তর্ভুক্ত, যা থেকে মসজিদসমূহকে পবিত্র রাখতে হয়; যেগুলোর জন্য

১ সহীহ বুখারী (২১৯) সংক্ষেপে, মুসলিম (২৮৫)

পবিত্রতা শর্ত। সুতরাং মসজিদ, তার কার্পেটসমূহ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট চত্বর, ছাদ ও অনুরূপ স্থানসমূহকে সকল প্রকার নাপাকী থেকে রক্ষা করতে হবে এবং যখনই সেগুলোর মধ্যে এর কিছু পতিত হবে, তখনই তা পবিত্র করতে হবে।

অনুরূপভাবে মসজিদকে কফ, শ্লেষ্মা, লালা, রক্ত, পুঁজ ইত্যাদির মতো নোংরা বস্তুসমূহ থেকে পবিত্র করার কথা এসেছে। এ মর্মে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলার দিকে থুথু দেখতে পেলেন, এটা তার প্রতি খুব অপছন্দনীয় মনে হল; এমনকি তার চেহারায় সে চিহ্ন দেখা গেল। তাই তিনি গিয়ে তা নিজ হাত দ্বারা ঘষে তুলে ফেললেন। তারপর বললেন:

«إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - فَلَا يَبْرُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ» ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: «أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا»

“তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে তার রবের সাথে মুনাজাত (ফিসফিস ক’রে কথা) করে, - অথবা তার রব তার ও কেবলার মধ্যস্থলে থাকেন- সুতরাং তোমাদের কেউ যেন কেবলার দিকে থুথু না ফেলে; বরং তার বাম পাশে অথবা পদতলে ফেলবে। অতঃপর তিনি তার চাদরের এক প্রান্ত ধরে তাতে থুথু নিক্ষেপ করলেন। তারপর তিনি তার এক অংশকে আর

এক অংশের সাথে ঘষে দিয়ে বললেন, কিংবা এইরূপ করে।”^১

মসজিদে থুথু ও শ্লেষ্মা ফেলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা নির্দেশ করে এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যার কোনো কোনোটিতে কিবলার দিকে অথবা ডান দিকে থুথু ফেলতে নিষেধ করা হয়েছে এবং বাম দিকে অথবা বাম পায়ের নিচে থুথু ফেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তা পা দিয়ে ডলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, থুথু ও শ্লেষ্মা স্বভাবগতভাবেই ঘৃণ্য বস্তু। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদের কিবলার দিকে থুথু দেখতে পেলেন তখন তিনি রাগান্বিত হলেন, এমনকি তার চেহারা লাল হয়ে গেল এবং তিনি দ্রুত তা ঘষে তুলে ফেললেন, অতঃপর সে স্থানটিতে খালুক বা জাফরান লাগিয়ে দিলেন।

এটা জানা কথা যে, মাসজিদ যদি মাটির তৈরি হয়, তবে তা ঘষে ফেলা সহজ এবং এর যমীন মাটির হওয়ায় তাতে যা কিছু পতিত হয়, তা দাফন করা যায় অথবা এর অপবিত্র মাটি বের করে ফেলা যায়।

আর যেহেতু বর্তমান যুগের মসজিদসমূহ সাধারণত টাইলসযুক্ত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কার্পেট বিছানো থাকে, যা ময়লা ও নাপাকি দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয় এবং এতে কফ, রক্ত, পুঁজ ইত্যাদির চিহ্ন প্রকাশ পায়,

^১ সহীহ বুখারী (৪০৫), মুসলিম (৫৫১)।

তাই এগুলোর মেঝেতে থুথু ফেলা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ; চাই তা কার্পেটের উপর হোক, বা দেয়ালে হোক অথবা টাইলসের উপর হোক। সুতরাং যার থুথু বা কফ আসবে, তার উচিত এর জন্য বাইরে চলে যাওয়া, অথবা রুমালে থুথু ফেলে তা বাইরে নিয়ে যাওয়া, অথবা তার কাপড়ের এক অংশে ফেলে তার এক অংশকে অপর অংশের উপর ঘষে নেওয়া, যেমনটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকে।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُنْظَفَ وَتُطَيَّبَ».

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করতে, সেগুলোতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ও তাতে সুগন্ধি ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।” সুফিয়ান (বিন উইয়াইনা) বলেছেন: “বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ নির্মাণ অর্থ হল: বিভিন্ন গোত্রসমূহে”।¹

পঞ্চম অনুচ্ছেদ: কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ অথবা মসজিদে কবরকে অন্তর্ভুক্ত করার হুকুম

যেকোনো ব্যক্তির কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নেই, সে যেই হোক না কেন; কেননা তা

¹ তিরমিযী, হাদীস নং (৫৯৪); এবং দেখুন: ‘ফুসূল ওয়া মাসাইল তাতা’আল্লাকু বিল মাসাজিদ’ (পৃ. ২৭)।

নিষিদ্ধ। শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: ইমামগণ একমত যে, কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না; কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛ فَإِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ.»

“নিশ্চয় তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কবরগুলোকে মসজিদ(ইবাদতের স্থান) বানাতো, খবরদার, তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানাবে না; কেননা আমি তোমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করেছি।”

আর মসজিদে কোনো মৃতকে দাফন করাও জায়েয নেই। যদি মসজিদটি দাফনের পূর্বে নির্মিত হয়ে থাকে, তাহলে তা পরিবর্তন করতে হবে: হয় কবরটি সমতল করে দিয়ে, অথবা তা নতুন হলে সেটিকে উত্তোলন করে।

আর যদি কবরের পর মসজিদ নির্মাণ করা হয়: তাহলে হয় মসজিদ অপসারণ করা হবে, নতুবা কবরের আকৃতি অপসারণ করা হবে। কবরের ওপর নির্মিত মসজিদে ফরজ বা নফল কোনো সালাত আদায় করা যাবে না; কেননা তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।¹

শাইখুল ইসলাম রাহিমাহুল্লাহর উল্লেখিত দলীল ছাড়াও এ বিষয়ে আরো দলীল রয়েছে: আয়েশা ও আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে

¹ মাজমুউল ফাতাওয়া (২২/১৯৪)।

বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি তার একটি চাদর দিয়ে নিজের মুখমন্ডল ঢাকতে লাগলেন। অতঃপর যখন তাতে অস্বস্তি বোধ করতেন, তখন তা চেহারা থেকে সরিয়ে ফেলতেন। এমন অবস্থাতেই তিনি বললেন:

«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

“ইয়াহুদী ও নাসারাদরে প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মাসজিদে(ইবাদতের স্থানে) পরিণত করেছে।” তিনি তাদেরকে অনুরূপ কার্যকলাপ থেকে সতর্ক করছিলেন।^১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুমূর্ষু অবস্থায় বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে লানত করেছেন, কারণ তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মাসজিদে(ইবাদত খানাতে) পরিণত করেছিল। আর তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, এটি ছিল পূর্ববর্তী কাফিরদের রীতি, যাতে তিনি তার উম্মাতকে তাদের অনুকরণ থেকে সতর্ক করতে পারেন এবং তাদের ওপর আল্লাহর সাথে শির্ক ও আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাতের দরজা বন্ধ করে দিতে পারেন।

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, উম্মু হাবীবা ও উম্মু সালামা হাবশায় তাদের দেখা একটি গির্জার কথা উল্লেখ করলেন, যাতে ছবি ছিল।

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৪৩৫), মুসলিম, হাদীস নং (৫৩১)।

অতঃপর তারা বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন:

«إِنَّ أَوْلَيْكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، وَصَوِّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ، فَأَوْلَيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

“নিশ্চয়ই তারা এমন জাতি যে, তাদের মধ্যে কোনো নেককার ব্যক্তি মারা গেলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ নির্মাণ করত এবং তাতে ঐসব চিত্রকর্ম অংকন করত। তারা হলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট সৃষ্টি।”^১

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অসুস্থতা থেকে আর সুস্থ হয়ে উঠেননি, সে অসুস্থতা অবস্থায় বলেছেন:

«لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

“ইয়াহুদী ও নাসারাদরে প্রতি আল্লাহর অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মাসজিদে(ইবাদত খানাতে) পরিণত করেছে।” কবরকে ইবাদতখানায় পরিণত করার আশংকা না থাকলে তার কবরকে উন্মুক্ত রাখা হতো। তবে তিনি আশংকা করেছিলেন যে, তার কবরকে মসজিদে পরিণত করা হবে।^২

১ সহীহ বুখারী, হাদীস নং (৪২৭), সহীহ মুসলিম, হাদীস নং (৫২৮)।

২ সহীহ বুখারী (১৩৯০), মুসলিম (৫২৯)

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: মসজিদ সুসজ্জিত করার বিধান

মসজিদ সুসজ্জিত করা এবং তা নিয়ে পরস্পর গর্ব করা উচিত নয়, কারণ ইমাম বুখারী আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: “তোমরা অবশ্যই মসজিদগুলো কে সজ্জিত করবে, যেভাবে ইয়াজদীরা ও খৃস্টানরা সজ্জিত করেছিল।”

আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “তারা তা নিয়ে পরস্পর গর্ব ও বড়াই করে, অথচ তা তারা স্বল্পসময়-ই আবাদ করে।”

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মসজিদসমূহ নির্মাণের নির্দেশ দেন এবং বলেন: “মানুষকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করো, আর লাল বা হলুদ রঙ ব্যবহার করা থেকে রিবত থেকে; কারণ এতে তুমি লোকদেরকে ফিতনায় ফেলবে।”^১

বর্তমান যুগে মসজিদ নিয়ে পরস্পর গর্ব করা ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং মানুষেরা এর সাজসজ্জা ও এর জন্য অধিক খরচের মাধ্যমে অপচয় করছে। মাশায়েখগণ মসজিদ সুসজ্জিত করার বৈধতার ফতোয়া দিয়েছেন, যখন ঘর-বাড়ি ও বাসস্থান সজ্জিত করা হয়, যাতে ঘর-বাড়ি ও বাসস্থানের তুলনায়

^১ বুখারী এই বক্তব্যগুলো তার ‘সহীহ’ গ্রন্থে দৃঢ়তাজ্ঞাপক শব্দে মু‘আল্লাক হিসেবে উল্লেখ করেছেন (১/ ৯৬-৯৭)।

মসজিদগুলো অসুন্দর ও তুচ্ছ মনে না হয়। কিন্তু তা হতে হবে সাজসজ্জা, রং ও রঞ্জক ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপচয় ও বাড়াবাড়ি না করে এবং সিরামিক, টাইলস ও কার্পেটের মতো অপয়োজনীয় জিনিসের বৈচিত্রের পিছনে অপচয় ও বাড়াবাড়ি না করে। অথচ এমন অনেক মসজিদ আছে যার নুন্যতম সংস্কার প্রয়োজন, সুতরাং ঐসব মসজিদের সংস্কারে অর্থ ব্যয় করা উচিত।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,

«أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللِّبْنِ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَعُمْدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللِّبْنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمْدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمْدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقْفَهُ بِالسَّاجِ» [185].

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তাঁর মসজিদটি ইট দ্বারা নির্মিত ছিল, তার ছাদ ছিল খেজুরের ডালের এবং তার খুঁটি ছিল খেজুর গাছের কাঠের। অতঃপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাতে কোনো কিছু বাড়াননি। আর উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সম্প্রসারণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের নির্মাণের ওপরই তা ইট ও খেজুরের ডাল দিয়ে পুনঃনির্মাণ করেন এবং খুঁটিগুলো পুনরায় কাঠের তৈরি করেন। এরপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তাতে ব্যাপক সম্প্রসারণ করেন। তিনি তার দেওয়াল নকশাকৃত পাথর ও চুন দিয়ে নির্মাণ

করেন এবং তার খুঁটিগুলো নকশাকৃত পাথর দিয়ে তৈরি করেন আর ছাদটি ঢালাই করে দেন”।¹

আল্লামা আব্দুল আযীয ইব্ন বায রাহিমাল্লাহ বলেন: উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কর্ম নকশা বিশিষ্ট পাথর, উত্তম কাঠ এবং চুনকাম অর্থাৎ দেয়াল রং করার মাধ্যমে মসজিদকে সুন্দর করাকে প্রমাণ করে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। যদিও সালাফদের জীবনযাপন অধিক উত্তম ও শ্রেয় ছিল, কিন্তু মানুষ যখন তাদের বাসস্থানকে সুন্দর করে নেয় এবং পুরাতন দালান-কোঠা থেকে বিমুখ হয়, আর মসজিদকে তার পুরোনো অবস্থায় রেখে দেওয়া যদি তাদেরকে সালাত ও মসজিদে একত্রিত হওয়া থেকে বিমুখ করে, তাহলে মসজিদের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু যা করেছেন, তার অনুরূপ করতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে অহংকার প্রকাশ করার জন্য নয়। আর মসজিদে কোন কিছু লেখা মাকরুহ। তাই উত্তম হলো তা সাদাসিধা রাখা।²

সপ্তম অনুচ্ছেদ: কাফিরের মসজিদে প্রবেশের হুকুম

মুসলিমদের জন্য কোনো কাফিরকে মসজিদুল হারাম এবং এর চারপাশের সমগ্র হারাম এলাকায়

¹ সহীহ বুখারী (৪৪৬)।

² আল-কাহতানী-এর ‘আল-মাসাজিদ’ থেকে উদ্ধৃত (পৃষ্ঠা: ৭১)।

প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হারাম; এর মূল দলীল হলো আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
عَمَلِهِمْ هَذَا...﴾

“হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র; কাজেই এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের ধারে-কাছে না আসে”... [আত-তাওবাহ: ২৮], আর অন্যান্য মসজিদের ক্ষেত্রে, যদি তাদের প্রবেশ কোনো শরয়ী উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। যেমন ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা, অথবা মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কাজ করা, অথবা মুসলিমদের কল্যাণকর কোনো কাজ করা, অথবা কোনো ওয়ায-নসীহত শোনা, অথবা কোনো মুবাহ কাজের জন্য প্রবেশ করা, যেমন মসজিদের ভেতরের পানি পান করার জন্য প্রবেশ করা, এ ধরনের অবস্থায় তা জায়েয আছে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুমামাহ ইবন উসালকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিলেন। এ মর্মে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

«بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟» فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدٌ، إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دِمٍّ، وَإِنْ تُنْعِمَ تُنْعِمَ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ الْعَدَى...» الحديث [187].

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল অশ্বারোহী নাজদের দিকে প্রেরণ করেন। তারা বানী হানীফার সুমামাহ ইবন উসাল নামে এক লোককে নিয়ে আসেন এবং মসজিদের একটি খুঁটির সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে গেলেন ও তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘হে সুমামাহ! তোমার কী ধারণা?’ সে বলল, ‘হে মুহাম্মাদ, আমার ধারণা খুব ভালো। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তবে খুনের উপযুক্ত ব্যক্তিকেই হত্যা করবেন। আর যদি অনুগ্রহ করেন তবে একজন গুণগ্রাহী ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ করবেন। আর যদি ধন-সম্পদ চান, তাহলে চান, যা চাইবেন তাই দেওয়া হবে।’ তিনি তাকে পরদিন পর্যন্ত রেখে দিলেন...” উক্ত হাদীসের শেষ পর্যন্ত।^১

নাজরানের একটি খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দল মসজিদে প্রবেশ করেছিল, আর যিমাম ইবনু সালাবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রবেশ করেছিল, যখন তিনি মসজিদে ছিলেন। আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:^২

«بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَآخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ، وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَكِيٌّ بَيْنَ ظُهُورِهِمْ، فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَكِيُّ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «قَدْ أَجَبْتُكَ»، فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي سَأَلْتُكَ فَمَشَدَّدٌ عَلَيْكَ فِي السُّؤَالِ فَلَا تَجِدُ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ: «سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ... إِلَى أَنْ قَالَ:

১ সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

২ সহীহ বুখারী ও মুসলিম।

فَقَالَ الرَّجُلُ: أَمَنْتُ بِمَا جِئْتُ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا
ضِمَامُ بَنِي ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ»

“একদা আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মসজিদে বসা ছিলাম, এক ব্যক্তি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে সেখানে এসে তার উটকে মসজিদে বসিয়ে বাঁধলেন। তারপর সাহাবীদেরকে বললেন: “তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে?” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাদের মধ্যেই হেলান দেওয়া অবস্থাতে ছিলেন, আমরা বললাম: হেলান দেওয়া এই সাদা ব্যক্তিটি। তখন সে বলল: হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন: “আমি তোমার জবাব দিয়েছি।” তখন সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলল: আমি আপনাকে কিছু বিষয় কঠিনভাবে জিজ্ঞাসা করছি, তবে আপনি আমার ব্যাপারে আপনার অন্তরে কোন কষ্ট নেবেন না। তখন তিনি বললেন: “তুমি জিজ্ঞাসা কর যা জানতে চাও।” ... লোকটি বলল: আপনি যা নিয়ে আগমন করেছেন তার উপরে আমি ঈমান আনলাম আর আমি হচ্ছি আমার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, এবং আমি হলাম যিমাম ইবনু ছা'লাবাহ বনু সা'দ ইবনু বকরের ভাই।”^১

^১ সহীহ বুখারী। দেখুন: মাজমু' ফাতাওয়া ওয়া মাক্বালাত ইবন বায, অষ্টম খণ্ড, কাফিরদের মসজিদে প্রবেশের হুকুম; এবং ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ৬/২৭৬।

মুয়াজ্জিন, ইমাম, খতীব এবং মসজিদ সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে তাদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো থেকে আমরা এখানে ততটুকুই উল্লেখ করতে সক্ষম হয়েছি। আমরা মুয়াজ্জিন, ইমাম ও খতীবকে আল্লাহ তা'আলার তাকওয়া অবলম্বন করার, ইলম অর্জন ও তা প্রসারে সচেষ্ট হওয়ার এবং এ বিষয়ে যত্নবান হওয়ার অসিয়ত করছি।

অতঃপর, আল্লাহই তাওফিকদাতা। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর উপর। আর আমাদের শেষ দু'আ এই যে, সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

(আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে বহু আয়াতে নিজ সম্মানার্থে বহুবচন ব্যবহার করেছেন, যা মূলত আরাবী ভাষার একটি রীতি। বাংলায় এরীতির ব্যবহার না থাকায় সে সব আয়াতের অনুবাদে বইটিতে একবচনই ব্যবহার করা হয়েছে। সম্পাদক, আব্দুর রব আফ্ফান)

মুয়াজ্জিন, ইমাম এবং খতীবের জন্য কতিপয় উপকারী তথ্যসূত্র

আযান ও ইকামাত, ডক্টর সাঈদ বিন আলী বিন ওয়াহাফ আল-কাহতানী, প্রকাশক: মাতবা'আ সাফীর, রিয়াদ।

সালাতে ইমামতি ও ইকতিদার বিধি-বিধান, ড. আব্দুল মুহসিন আল-মুনীফ।

কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে সালাতে ইমামতি, সাঈদ বিন আলী বিন ওয়াহফ আল-কাহতানী।

উসলুবু খুতবাতিল জুম'আ, আব্দুল্লাহ বিন দ্বাইফুল্লাহ আর-রুহাইলী, প্রকাশনায়: ইসলামী বিষয়াবলি, দাওয়াহ ও ইরশাদ মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব।

সালাতে ইমামতি: কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে এর পরিচিতি, ফযীলত, প্রকারভেদ, আদব ও বিধি-বিধান, ডক্টর সাঈদ ইবন আলি ইবন ওহাফ আল-কাহতানী, প্রকাশক: মাতবা'আতু সাফীর, রিয়াদ।

জুম'আর খুতবাসমূহ ও খতীবদের দায়িত্বসমূহ, প্রস্তুতকরণে: দাওয়াহ ও ইরশাদ পরিষদ, ইসলামী বিষয়ক, দাওয়াহ ও ইরশাদ মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব।

কিতাব ও সুন্নাহের আলোকে জুম'আর খুতবা, লেখক: আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মাদ আল-হামদ, প্রকাশক: ইসলামী বিষয়ক, দাওয়াহ ও ইরশাদ মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব।

জুম'আর খুতবা ও এর ফিকহী বিধানাবলি, আব্দুল আযীয ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ আল-হুজাইলান, প্রকাশক: ইসলামী বিষয়াবলি, দাওয়াহ ও ইরশাদ মন্ত্রণালয়, ইসলামী গবেষণা ও অধ্যয়ন কেন্দ্র।

জুম'আর খুতবা এবং উম্মাহর প্রতিপালনে এর ভূমিকা, আব্দুল গনী আহমাদ জাবর মুযহির, প্রকাশক: ইসলামী বিষয়ক, দাওয়াহ ও ইরশাদ মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব।

আমীর বিন মুহাম্মাদ আল-মাদরি-এর “সফল খতীব হওয়ার একান্নটি অসিয়ত ও অসিয়ত” ইসলামী বিষয়াবলী, দাওয়াহ ও নির্দেশনা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত, সৌদি আরব।

জুম‘আর সালাত: কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে এর পরিচিতি, শর্তাবলি, ফযীলাত, বৈশিষ্ট্য, আদব ও বিধানাবলি—। রচনা: ড. সাঈদ বিন আলী বিন ওয়াহাফ আল-ক্বাহত্বানী। প্রকাশনায়: মাতবা‘আতুস সাফীর, রিয়াদ।

জুম‘আর মিশ্বর আমানত ও দায়িত্ব, আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন হুমাইদ, প্রকাশক: ইসলামী বিষয়ক, দাওয়াহ ও ইরশাদ মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব।

জুম‘আর খুতবা প্রস্তুতির পদ্ধতি, ডক্টর সালিহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হুমাইদ, প্রকাশক: ইসলামী বিষয়ক, দাওয়াত ও নির্দেশনা মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব।

আব্দুল্লাহ ইবনু সালিহ আল-ফাউযানের “ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের জন্য রিসালাসমূহ”, দারু ইবনিল জাওয়াযী।

মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মুক্তাদিগণের প্রতি একটি পত্র, শাইখ আব্দুল্লাহ ইবন জারুল্লাহ আল-জারুল্লাহ।

কুয়েতি ফিকহ বিশ্বকোষ, খুতবা, ইমামত, আযান ও মসজিদের অধ্যায়সমূহ।

সূচিপত্র

মুয়াজ্জিন, ইমাম, খতীব এবং মসজিদ বিষয়ক পুস্তিকা	2
মুয়াজ্জিন, ইমাম, খতীব এবং মসজিদের বিধান বিষয়ক উপকারী পুস্তিকা	2
প্রথম অধ্যায়: আযান ও ইকামাতের বিধানসমূহ	3
প্রথম অনুচ্ছেদ: আযান ও ইকামাতের সংজ্ঞা	4
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: আযান ও ইকামাতের হুকুম	4
তৃতীয় অনুচ্ছেদ : আযান ও ইকামাতের ফযীলত	7
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: আযান ও ইকামাত শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ	12
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: মুয়াজ্জিনের জন্য আবশ্যকীয় গুণাবলী	16
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: আযান ও ইকামাতের পদ্ধতি	22
সপ্তম অনুচ্ছেদ: আযান শ্রবণকারী যা বলবে, এবং এর পরে যে দু'আ করবে	26
অষ্টম অনুচ্ছেদ: আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার হুকুম	32
নবম অনুচ্ছেদ: আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময় কতটুকু?	33
দশম অনুচ্ছেদ: মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব-কর্তব্য ও আদব	34
দ্বিতীয় অধ্যায়: ইমামতির বিধি-বিধান	37
প্রথম অনুচ্ছেদ: ইমামতির সংজ্ঞা	37
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: ইমামতের শরয়ী বিধান ও ফযীলত	38
ইমামতির ফযীলতসমূহের অন্যতম হল:	38
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: ইমামতির অধিক হকদার কে	40
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: যাদের ইমামতি হারাম:	45
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: যাদের ইমামতি মাকরুহ	48
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: ইমাম ও মুক্তাদির স্থান	51
সপ্তম অনুচ্ছেদ: ইমামের অগ্রগামী হওয়া	53

অষ্টম অনুচ্ছেদ: ইমামতি ও জামাত বিষয়ক বিবিধ বিধি-বিধান	55
নবম অনুচ্ছেদ: ইমামের পালনীয় সুন্নাতসমূহ	58
দশম অনুচ্ছেদ: ইমামের যোগ্যতা ও গুণাবলী	63
ইমামের ক্ষেত্রে অপরিহার্য জ্ঞানগত যোগ্যতাসমূহ:	65
প্রধান চারিত্রিক উপাদানসমূহ:	67
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: জুমু'আর সালাত ও খুতবা	76
প্রথম অনুচ্ছেদ: জুমু'আর সালাত	76
প্রথম মাসআলা: জুমু'আর সালাতের পরিচয় ও সময়:	76
দ্বিতীয় মাসআলা: জুমু'আর সালাতের হুকুম কী এবং কার উপর তা ওয়াজিব?	79
তৃতীয় মাসআলা: জুমু'আর সালাতের পদ্ধতি:	82
চতুর্থ মাসআলা: জুমু'আর কিসের মাধ্যমে (কতটুকুর মাধ্যমে) পাওয়া যায়?	84
পঞ্চমত: জুমু'আর দিনে যা করা হারাম বা মাকরুহ:	84
ষষ্ঠ মাসআলা: জুমু'আর সুন্নাতসমূহ:	88
সপ্তম মাসআলা: জুমু'আর নফল:	95
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: জুমু'আর খুতবা সম্পর্কে	97
প্রথম মাসআলা: জুমু'আর খুতবা:	97
দ্বিতীয় মাসআলা: খুতবার হুকুম:	97
তৃতীয় মাসআলা: খুতবার শর্তসমূহ:	98
চতুর্থ মাসআলা: খুতবার রুকনসমূহ:	100
পঞ্চম মাসআলা: খুতবার সুন্নাতসমূহ:	102
ষষ্ঠ মাসআলা: জুমু'আর খুতবার অনুবাদ	108
সপ্তম মাসআলা: খতীবের যোগ্যতাসমূহ:	109
খতীবের মাঝে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞানগত যোগ্যতাসমূহ বিদ্যমান থাকা জরুরী:	111
প্রধান চারিত্রিক যোগ্যতাসমূহ:	114

অষ্টম মাসআলা: খুতবা ও খতীবের আদবসমূহ:	123
নবম মাসআলা: খুতবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:.....	125
দশম মাসআলা: খুতবা প্রস্তুত করার পদ্ধতি:	126
চতুর্থ অধ্যায়: মসজিদের বিধানসমূহ.....	131
প্রথম অনুচ্ছেদ: মসজিদের সংজ্ঞা.....	131
মসজিদ ও মুসাল্লার পার্থক্য.....	132
দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ: মসজিদ নির্মাণ করা ও তার ফযিলত.....	132
তৃতীয় অনুচ্ছেদ: মসজিদ নির্মাণ ও আবাদ এবং তার ফযিলত.....	136
চতুর্থ অনুচ্ছেদ: মসজিদসমূহকে পবিত্র রাখা এবং ময়লা- আবর্জনা থেকে তাকে রক্ষা করা।.....	137
পঞ্চম অনুচ্ছেদ: কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ অথবা মসজিদে কবরকে অন্তর্ভুক্ত করার হুকুম.....	142
ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ: মসজিদ সুসজ্জিত করার বিধান	146
সপ্তম অনুচ্ছেদ: কাফিরের মসজিদে প্রবেশের হুকুম.....	148
মুয়াজ্জিন, ইমাম এবং খতীবের জন্য কতিপয় উপকারী তথ্যসূত্র	152